শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

तरङ्गिणी

Taraṅgiṇī

A Yearly House Magazine
of Sanskrit Department

তরঙ্গিণী

সংস্কৃতবিভাগীয়-বার্ষিক-পত্রিকা
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

प्रधानसम्पादक: (Chief Editor)

Dr. Sukdeb Ghosh
Principal, Srikrishna College

सम्पादक: (Editor)

Rajib Sinha
Assistant Professor & Head
Department of Sanskrit
Srikrishna College

सहसम्पादका: (Co-Editors)

Sudeshna Roy, Manjusha Chakraborty, Manju Ghosh, Riya Biswas, Amit Kumar Mondal

2020-2021

তরঙ্গিণী (তরঙ্গিণী)

Taraṅgiṇī

সংস্কৃতবিভাগীয়-বার্ষিক-পত্রিকা

A Yearly House Magazine of Sanskrit Department

প্রধান সম্পাদক :

শুকদেব ঘোষ

অধ্যক্ষ, শ্রীকৃষ্ণমহাবিদ্যালয়

সম্পাদক :

রাজীব সিন্‌হা

বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণমহাবিদ্যালয়

সহসম্পাদক :

সুদেষ্ণা রায়, মঞ্জুষা চক্রবর্তী, মঞ্জু ঘোষ,

রিয়া বিশ্বাস, অমিত কুমার মণ্ডল

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

সংস্কৃত বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

২০২০-২০২১

Taraṅgiṇī

A yearly Sanskrit Departmental Megazine of Srikrishna College

তরঙ্গিণী

সংস্কৃতবিভাগীয়-বার্ষিক-পত্রিকা, শ্রীকৃষ্ণমহাবিদ্যালয়, বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশ কাল

মার্চ, ২০২১

সম্পাদনা

রাজীব সিনহা

সংশোধন ও সহযোগিতায়

মঞ্জু ঘোষ, অন্যান্য বিভাগীয় অধ্যাপক এবং বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

প্রকাশক

সংস্কৃতবিভাগ, শ্রীকৃষ্ণমহাবিদ্যালয়, বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

নামাঙ্কন, অলংকরণ ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

রাজীব সিনহা, বিভাগীয় অধ্যাপকবর্গ এবং বিদ্যার্থীগণ

টঙ্কন ও মুদ্রণে

বিশ্বজিৎ মেটিয়া

শুভেচ্ছাবার্তা

প্রসন্নতার বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বিস্তার হেতু "তরঙ্গিণী" নামক বিভাগীয় বার্ষিকী পত্রিকা ২০২০-২১ প্রকাশিত হতে চলেছে। নিবোদিত রচনাকারীর স্বীয় সৃজনাত্মক ক্ষমতার অভিব্যক্ত প্রদানকারী সামাজিক পরিবর্তনের এক সশক্ত মাধ্যম হল পত্রিকা। অধ্যবসায়ীর বৌদ্ধিক, শৈক্ষণিক, নৈতিক এবং মানসিক বিকাশ হেতু পত্রিকা প্রকাশনা রূপ কার্য মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃতি পরম্পরার এক অদ্বিতীয় ঝলক।

মহামারীকালেও বিদ্যার্থীর ব্যক্তিত্ব নির্মাণহেতু, বিদ্যার্থীর জ্ঞানাত্মক বিকাশ এবং সাহিত্য সৃজনকে প্রোৎসাহিত করার দৃষ্টিতে সংস্কৃতবিভাগীয় এই পত্রিকা প্রকাশনাদি কার্য এক সার্থক প্রয়াস এবং আশা করছি পত্রিকাটি বিদ্যার্থীগণের জ্ঞানবর্ধক হবে।

পত্রিকার সম্পাদকমন্ডল, মার্গদর্শক, সমস্ত অধ্যাপক সহিত সংস্কৃত বিভাগীয় বিদ্যার্থীদের ধন্যবাদপূর্বক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

ইতি –

শুকদেব ঘোষ

অধ্যক্ষ

শ্রীকৃষ্ণমহাবিদ্যালয়

বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদকীয়

পঠেয়ম্ সংস্কৃতং, জগতি সর্বমানবান্, প্রাপয়েম ভারতং, সপদি পরমবৈভবম্।।

সংস্কৃতশাস্ত্রের বৈভবকে বর্তমান সমাজে সংযোজন এবং ভাবী সমাজের আদর্শ প্রস্তুত হেতু বিবিধ অনুসন্ধানাদি কার্যের দর্পণ স্বরূপ পত্রপত্রিকার আবশ্যকতা বিদ্যমান। শাস্ত্রীয় উপাসনা, বুদ্ধিচাতুর্যতা, সুমধুর লেখনকলার সামঞ্জস্যতা, অভিনব রচনা কৌশলের সার্থকতা হেতু সংস্কৃত বিভাগীয় 'তরঙ্গিণী' নামক বার্ষিকী পত্রিকা। শাস্ত্রের নানাদিক চয়নিত এই সংকলন পাঠকবর্গের পরিশ্রমসাধ্য আনন্দদায়ী প্রতীক।

সকারাত্মক চিন্তার উৎকর্ষবৃদ্ধিহেতু, লিখনকার্যের সংকোচিত প্রবৃত্তি দূর হেতু পাঠকবর্গের ভাবনা, বিচার, সৃজনাত্মকতা, জ্ঞানবোধ বিকশিত করার প্রবৃত্তি হেতু স্বরচিত ভাবাভিব্যক্তির মাধ্যমে স্বীয় প্রতিভা স্থাপিত করার প্রয়াস এবং পঠনপাঠনের প্রতি আকৃষ্ট উৎপন্ন করার প্রেরণা সমাহিত এই তরঙ্গিনীতে। তরঙ্গিণী=স্রোতস্বিনী / প্রবাহিনী বা নদী। পাঠকবর্গের জ্ঞান ধারা এই পত্রিকা থেকে নির্গত হয়ে জ্ঞানসমুদ্রে প্রবাহিত হোক।

বৈদিকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের নানা নিদর্শন, রাজনৈতিক, সামাজিক পক্ষ, নৈতিকতা, প্রাচ্য ভারতীয় জ্ঞানের দিগদর্শন স্বরূপ সুধীজনের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সংস্কৃতশাস্ত্রের উত্থান এবং সংরক্ষণ দ্বারা এই পত্রিকা বিশিষ্ট স্থান স্থাপনা পূর্বক সতত গতিশীল থেকে সমাজ, নগর, দেশকে গৌরবান্বিত করুক এই তরঙ্গিণী।

এই কার্যের পূর্ণতাপ্রাপ্তিহেতু তথা সাকাররূপ প্রদানকারী সমস্ত সম্পাদকীয় সদস্য, মহাবিদ্যালয় পরিবার, মুদ্রণকর্তা, এবং পাঠকবর্গকে হার্দিক অভিনন্দন পূর্বক ধন্যবাদ।

বিভাগীয় মুখ্য ও পত্রিকা সম্পাদক

রাজীব সিনহা

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সহসম্পাদকীয় কলমে

শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শা সুরধনি প্রবাহিনী।
সত্যময় জ্ঞানক্ষেত্রে বিরাজ হে তরঙ্গিনী।।

অহংহীন শাশ্বত ও নিত্যস্বরূপ অনন্ত জ্ঞানালোকের আলোকে আলোকিত হওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।সর্বদা নিরন্তর পুঁথিগত বিষয়ের অনুধ্যানের পাশাপাশি আমাদের আত্মহৃদয়ে এই বিষয়গুলির নিদির্ধ্যাসনের মাধ্যমেই নবচেতনার বিকাশ ঘটানো উচিৎ। তাই ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ভূমিতে জ্ঞানবৃক্ষের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণমহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "তরঙ্গিনী" পত্রিকাটি প্রকাশের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল।তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় সুখদেব মহাশয়ের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।মূলতঃ ছাত্রছাত্রীদের লেখনশৈলীর বিকাশে আমাদের এই প্রচেষ্টা।ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সম্পদ ও ভবিষ্যতের বনস্পতি।তাই তাদের অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ের জাগরণ ও প্রোৎসাহদানের জন্য আমাদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিৎ।সাধারণতঃ লেখালিখির মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের গহনে প্রবেশ করা যায় এবং বিষয়গত স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সকলের কাছেই উপস্থাপন করা যায়।তাই ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ে সুপ্ত থাকা প্রতিভার বিকাশ ও জাগরণের জন্য-ই "তরঙ্গিনী"-পত্রিকার প্রকাশ।এই পত্রিকার মাধ্যমে একাধারে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-অর্জনের পাশাপাশি বিষয়ে গভীরে প্রবেশ করার মানসিকতা তৈরী হবে,তেমনি লেখালিখির মাধ্যমে তাদের চিন্তাজগৎ আলোড়িত হবে এবং মননে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে।

সাধারণতঃ অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায়,নিয়মের দ্বারা বদ্ধ সিলেবাসভিত্তিক পঠন-পাঠনে অনেকসময় ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ হারিয়ে যায়।তাই বিভিন্ন প্রোৎসাহদানকারী শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিঃসন্দেহে তাদের হৃদয়ে বিষয়ের প্রতি অনুরাগের উন্মেষ ঘটাবে বলেই মনে হয়।তাই পাঠকবৃন্দের কাছে বিশেষ অনুরোধ শ্রীকৃষ্ণপরিবারের চলার পথে সংস্কৃতবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের অনলস এই প্রচেষ্টাই যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে,তাহলে তা অনভিজ্ঞতার ফল মনে করে সহৃদয়চিত্তে মার্জনা করবেন ।আপনাদের শুভাশিষ একান্তকাম্য।

ইতি
সহসম্পাদকবৃন্দ

সূচীপত্র

নং	নাম	আখ্যাপ্রদান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	রিয়া বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	বৈদিক দেবতা	৯
২.	সুমন সরকার	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্র	বৈদিক যুগের গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা	১২
৩.	সোনিয়া আগরওয়াল	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	ভারতীয় সমাজে নীতিকথার প্রভাব	১৫
৪.	তমা মণ্ডল	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	ভারবি ও তাঁর কিরাতার্জুনীয়ম্ এর বিবরণ	১৮
৫.	শুচিস্মিতা পাল	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	শ্রীমদ্ভগবদগীতা	২১
৬.	সুস্মিতা শীল	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি	২৫
৭.	রিমা সরকার	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	কর্ম ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানযোগের ভূমিকা	২৭
৮.	সোমা মুখার্জী	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	লোক সচেতনতায় উপনিষদের অবদান	২৯
৯.	পায়েল বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন যোগ	৩২
১০.	অহনা আচার্য্য	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	মহাকবি ভাস	৩৫
১১.	আল্পনা পাল	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	আদর্শ নারীত্বভাবনায় ভবভূতি	৩৯
১২.	প্রিয়া বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে মানবিক মূল্যবোধ	৪২
১৩.	অঙ্কিতা বৈরাগী	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পরিবেশ সচেতন	৪৫
১৪.	নিরূপমা বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	সংস্কৃত ভাষার প্রাক্ ইতিহাস	৪৮
১৫.	শিউলি হানিপ	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি	৫২
১৬.	মঞ্জু ঘোষ	সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপিকা	সংস্কৃত সাহিত্যে গণিতশাস্ত্র চর্চা	৫৭
১৭.	রিয়া বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপিকা	সংস্কৃত ভাষার ইতিবৃত্ত	৬২
১৮.	সঞ্চিতা ভৌমিক	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের	বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা	৬৭

		ছাত্রী		
১৯.	প্রিন্সি বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	বৈদিক দেবতা	৭০
২০.	নেহা মন্ডল	সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কালিদাসের “প্রকৃতি চেতনা”	৭৩
২১.	অনামিকা বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থা	৭৬
২২.	দেবাঙ্গনা দাস	সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী	বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা	৮১
২৩.	রিঙ্কি পাল	সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী	‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে প্রতিফলিত সমাজচিত্র	৮৮
২৪.	লাবণী পাল	সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী	সংস্কৃত সাহিত্যে রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা	৯৫
২৫.	দীপজ্যোতি মন্ডল	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্র	কবি জয়দেব এবং গীতগোবিন্দম্	৯৯
২৬.	প্রিয়াঙ্কা মন্ডল	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	সংস্কৃত সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ	১০৩
২৭.	সাথী মন্ডল	সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী	জীবন যোগের উপকারিতা	১০৬
২৮.	সুস্মিতা পোদ্দার	সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে কালিদাসের “প্রকৃতি চেতনা”	১১১
২৯.	অয়ন্তিকা ঘোষ	সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী	অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের চিকিৎসাজ্ঞান	১১৫
৩০.	সীমা বিশ্বাস	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	মনুষ্য জীবনে কর্মযোগের ভূমিকা	১২১
৩১.	অন্নপূর্ণা স্যান্যাল	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রামায়ণের প্রভাব	১২৪
৩২.	রিয়া রায়	সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কালিদাসের প্রকৃতি চেতনা	১৩২
৩৩.	রাজীব সিন্‌হা	সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপক	মেকি খেলা	১৩৪
৩৪.	রাজীব সিন্‌হা	সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপক	জীবন	১৩৫
৩৫.	অমিত কুমার মণ্ডল	সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপক	তোমার তরে	১৩৬
৩৬.	গ্যালারী	সংস্কৃত বিভাগ	-	১৩৭-১৬৬

বৈদিক দেবতা

রিয়া বিশ্বাস

সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

ঋগবেদ মূলতঃ ভারতীয় আর্যজাতির প্রধান ধর্মমূলক গ্রন্থ। এই সংহিতায় কয়েকটি সূক্ত বাদ দিলে অধিকাংশই প্রাকৃতিক শক্তির দৈবিভাবনায় সমৃদ্ধ, অপরূপ কল্পনার বিচিত্র প্রকাশ। অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ঐশী শক্তিরূপে কল্পনা করে তার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন বৈদিক ঋষিগণ। ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রগুলি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত – স্তুতি ও প্রার্থনা। স্তুতি শ্রেণির মন্ত্রে দেবতার নাম, রূপ ও কর্মের উল্লেখ করে দেবতার স্তব করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে ধন, আয়ু, শক্তি, পুত্র ইত্যাদি। Winternitz সাহেব বলেছেন যে, ঋগ্‌বেদের স্তোত্রগুলিতে দেবতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ মেলে এবং তাই স্তোত্রগুলি, অত্যন্ত মূল্যবান্। পৃথিবীর আদিম ধর্মগুলির উৎপত্তির ইতিহাস আমরা ঋগ্বেদে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাই।

দেবতাতত্ত্ব :

আচার্য যাস্ক তার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে 'দেব' এবং 'দেবতা' শব্দ দুটির একই অর্থ করেছেন। তিনি 'দেব' শব্দের দ্বারা তিনটি অর্থ করেছেন— যাঁরা ঈশ্বর দান করেন এবং আমাদের ঈপ্সিত বস্তুগুলি দান করেন, তেজোময় বলে যারা পদার্থকে প্রকাশিত করেন এবং যাঁরা সাধারণত দ্যুলোকে অবস্থান করেন— তারাই দেবতা। শৌনকাচার্যের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে ধর্মীয় চিন্তাধারায় অনুসরণ করলে দেবতাতত্ত্বের এক বিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেবতাবাদ ও অতিদেবতাবাদের মধ্য দিয়ে এক দেবতাবাদে উত্তরণ ঘটেছে বৈদিকদেবতা তত্ত্বের।

প্রাকৃতিক রূপের মূর্তরূপ :

ঋগবেদ এর দেবতাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে অধিকাংশ দেবতাই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক শক্তিতে জীবিত সত্ত্বার আরোপিত মহিমময় প্রকাশ। প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা। যেমন— প্রাকৃতিক জ্বলন্ত সূর্য, স্নিগ্ধ চন্দ্র, প্রজ্বলিত যজ্ঞের অগ্নি, বিদ্যুৎ, তারকাখচিত রাত্রির আকাশ, হাস্যময়ী ঊষা, কলকল্লোলিনী নদ-নদী, শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা প্রভৃতি। তেমনি আবার এই প্রকৃতিরই ভয়ংকর বিধ্বংসী রূপের প্রকাশে ভয় ও বিস্ময়ে হতবাক হতেন তাঁরা। এই সমস্তই ঋষিদের মনে আনন্দ-বিস্ময়-ভয় ও বিহ্বলতা সঞ্চার করত। এই সবেরই অন্তরালে অমোঘ দৈবিশক্তির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ অনুভব করতেন ঋষিরা। ধীরে ধীরে নানা ঋক্‌মন্ত্রে এই সকল প্রাকৃতিক

শক্তি বিভিন্ন দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে। Winteritz বলেছেন— "Only gradually is accomplished in the songs of the Rigveda itself, the transformation of these natural phenomenon into mythological figures, into God's and Goddesses."

এইভাবেই সূর্য, সোম, অগ্নি, মরুদ্‌গণ, বায়ু, ঊষা, পৃথিবী, পর্জন্য, রাত্রি প্রভৃতি দেবতাদের নাম থেকেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রাকৃতিক শক্তি ছিল তাদের উৎস। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপের ফলেই যে এইসকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। Winternitz বলেছেন— "So the songs of the Rigveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of the most striking natural phenomenon."

কিছু পৌরাণিক দেবতা আছেন যাঁদের নাম থেকে স্পষ্ট নির্দেশ করা যায় না যে তাঁরা কোন প্রাকৃতিক শক্তির ঈঙ্গিত বহন করেছেন। এই সমস্ত দেবতার মূল প্রাকৃতিক পরিচয় কিছুটা বিলুপ্ত হলেও তাঁদের শক্তিমত্তা ও অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা তাদের মূল পরিচয় আবিষ্কার করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর দেবতারা হলেন— ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অদিতি, বিষ্ণু, পূষণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, রুদ্র প্রভৃতি। ক্রমশঃ এরা দেবতাদের নামে রূপান্তরিত হয়েছেন। মহর্ষি কত্যায়ন সর্বানুক্রমনীতে বলেছেন সকল দেবতার মূল গর্ভ একই সত্ত্বার ভিন্ন ভিন্ন নাম – "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। " বৈদিক ঋষিরা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন। সমস্ত দেবতাকে এই একেরই প্রকাশ রূপে তারা কল্পনা করেছেন। বহু ঈশ্বরবাদ ঋগ্‌বেদে আপাত প্রতীতিমাত্র।

ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, অদিতি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাকৃতিক শক্তির নির্দেশক তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। মতভেদ সত্বেও বিখ্যাত Mythologist গণ একথা মেনে নিয়েছেন যে বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশই এসেছেন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে অর্থাৎ "বৈদিক দেবতারা হলেন প্রাকৃতিক রূপেরই মূর্তরূপ। "

ঋগ্‌বেদ এর দশম মন্ডলে আবার কিছু দেবতা আছেন যারা মূর্তিবিহীন ভাবমাত্র। এরা হলেন শ্রদ্ধা প্রভৃতি। আরও কিছু দেবতা ঋগ্‌বেদে গুরুত্ব পেয়েছেন। এই সমস্ত দেবতাকে অনেকে 'Lower mythology' বলেছেন। যেমন – অপ্সরা, গন্ধর্ব প্রভৃতি। এরা যথাক্রমে ভূত, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতিতে অধিষ্ঠান করেন এবং বন প্রভৃতি আত্মাস্বরূপ। বর্তমান যুগেও যে একখন্ড প্রস্তর বা একটি প্রাচীন বৃক্ষকে গ্রাম দেবতা হিসাবে পূজা করতে দেখা যায় তারও উৎস সুদূর বৈদিক যুগেই।

উপরের আলোচনা থেকে একটা কথা বলা যায় যায় যে, ঋগ্বেদের দেবতা অর্থের মানে বুঝি পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোক-এর এইসব প্রাকৃতিক বিষয়, যাঁদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাঁদের

ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের মনে শিল্পশালাই দেবতা নির্মাণের এই সহজ সরল অনাড়ম্বর পদ্ধতি আমাদেরকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক আচার্য ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের উক্তিটি প্রসঙ্গত স্মরণীয় – "The process of God-making in the factory of man's maind cannot be seen so clearly any where else as in the Rigveda."

গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১) যুধিষ্ঠির গোপ, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, আগস্ট-২০০৩।

২) নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৩) শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল, বৈদিক ভারত, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৫ এপ্রিল ১৯৯০।

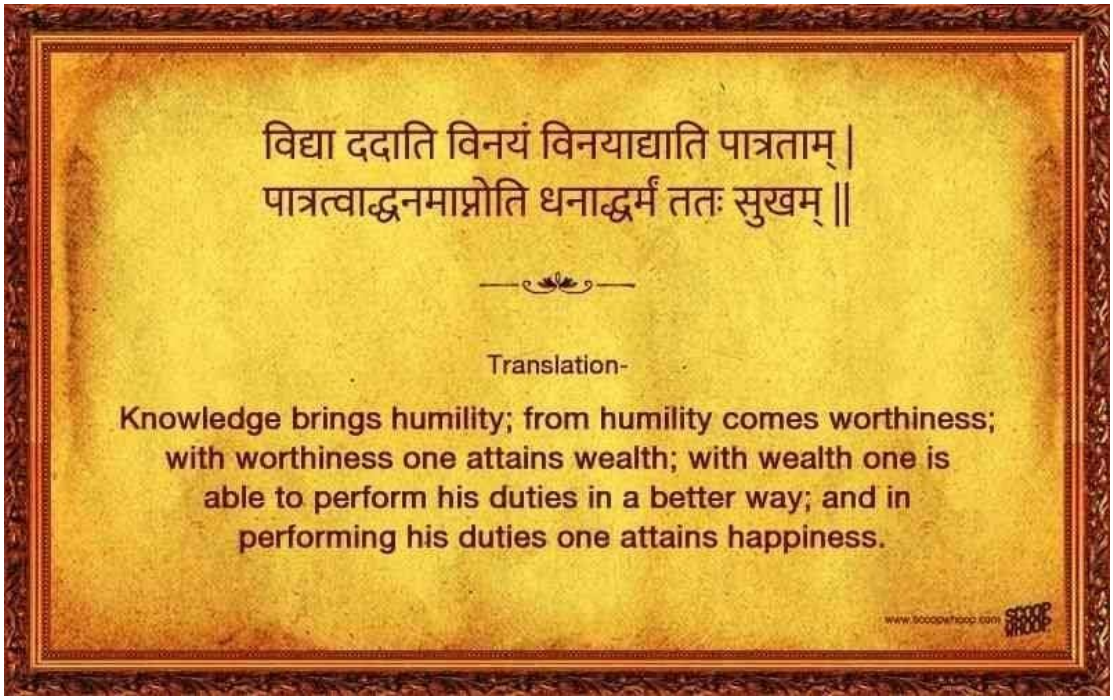

বৈদিক যুগের গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা

সুমন সরকার

সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্র

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে মোটামুটি তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বা বৈদিক যুগে ভারতের শিক্ষা, মধ্যযুগের ভারতের শিক্ষা এবং আধুনিক ভারতের শিক্ষা। আধুনিক ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার উৎস খুঁজতে হবে প্রাচীন ভারতেই।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বৈদিক যুগ বলে অনুমান করা হয়। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে বেদকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা হল বৈদিক শিক্ষা। প্রাচীন ভারতবর্ষে গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করানো হতো। বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি অস্ত্রচালনা, চিকিৎসা করার চর্চা করানো হতো। সঙ্গে ব্যাকরণ, গণিত, ভাষা শিক্ষার চর্চা হতো। শিক্ষিত মেয়েরা নাচ গানের চর্চা করত। প্রায় ১২ বছর ধরে শিক্ষাদান করা হতো গুরুগৃহে। বৈদিক যুগে গুরুদক্ষিণা দেবার প্রচলন ছিল। গুরুদক্ষিণা হিসেবে গরু দান করা হতো।

বৈদিক যুগে শিক্ষার ব্যাপক পাঠক্রম ছিল না। চারটি বেদ-(ঋক্, সাম যজুঃ অথর্ব)। ছয়টি বেদাঙ্গ – (ছন্দ, ব্যাকরণ, শিক্ষা, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষ শাস্ত্র)। উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বৈদিক যুগে গুরুগৃহের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও ছাত্রদের গুরুগৃহে আচরণবিধি পালনের জন্য সূত্র, দার্শনিক জ্ঞানের জন্য বেদান্ত অধ্যয়ন করানো হতো। এছাড়াও ইতিহাস, পুরাণ, অস্ত্রশিক্ষা, মন্ত্রশিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা, তর্ক শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছিল বৈদিক যুগে শিক্ষার পাঠক্রমে।

প্রাচীন ভারতে বা বৈদিক যুগে শিক্ষার প্রধান ছিলেন গুরু। গুরুর আদেশ শিক্ষার্থীরা কখনও অমান্য করত না। প্রাচীনকালে ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন বাধ্যতামূলক ছিল। বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নতি সাধন করা। তাই ছাত্রদের সবদিক থেকে পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করতেন গুরু। তাই তাদের সবরকম শিক্ষাদান করানো হতো গুরুগৃহে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তখন শিক্ষা ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। আর্য ঋষিরা মনে করতেন যে আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। আবার হিন্দু দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ। শিক্ষার শেষ নেই – "যাবজ্জীবন অধীতে বিপ্রঃ।" বিদ্যা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। "সা বিদ্যা যা বিমুক্ত যে"। পরাবিদ্যা

ও অপরাবিদ্যার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বিকশিত হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যা বা আধ্যাত্মবিদ্যা হলো পরাবিদ্যা। আর যাবতীয় শিল্প বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি লৌকিক বিদ্যা হল অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা শিক্ষার শেষ কথা হলেও অপরাবিদ্যা ও শিক্ষা যথেষ্ট স্থান পেয়েছিল।

বৈদিকযুগে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পেতেন। তাদের স্বাধীনতাও যথেষ্ট ছিল। নারীরা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তারা বৈদিক জ্ঞান অর্জনের অধিকারীও ছিলেন। নারীরা পুরুষদের সমান দর্শন ব্যাকরণ তর্কবিদ্যা অর্থশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। শুধুমাত্র তাদের পৈতে পরার অধিকার ছিল না। উপনিষদে বেশকিছু মহিলা শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায়। যেমন – সুলভা, প্রথিতেয়ী, মৈত্রেয়ী, কার্যকাশিনী ইত্যাদি। পাণিনির লেখাতেও "ছাত্রীশালা" "আচার্যিনী" অর্থাৎ মহিলা শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহিলারা বেশ কিছু কলায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। যেমন— রন্ধন, নৃত্য, অঙ্কন, সংগীত, সেলাই, বয়ন, তাঁতের কাজ ইত্যাদি। তাছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় মহিলারা যুদ্ধ শাস্ত্রেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। যেমন— মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসন কালে চিত্রাঙ্গদাকে একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। সুভদ্রা ছিলেন দক্ষ রথচালক। বিসপালা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহর্ষি পতঞ্জলি মহিলা শিক্ষিকাদের "ঔধমেধা" এবং শিক্ষার্থীনীদের "ঔধামেধী" বলে উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় মহিলা রক্ষীরা ছিলেন।

শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি অনেক কাজ কর্ম এবং আচরণবিধি পালন করতে হত। গো পালন, ভিক্ষা সংগ্রহ এবং গৃহের কাজ রন্ধনের জন্য কাঠ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাবলম্বন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি মনুষ্যত্ববোধ সেবামূলক প্রভৃতি গুণ বিকশিত হত। ভিক্ষার দ্বারা গুরুগৃহ পরিচালনা করা হতো। তাছাড়াও আশ্রমে শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়ম পালন করতে হতো। মাদকদ্রব্য, বিলাসসামগ্রী, বেশভূষা, অট্টহাসি, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, অবাধে চলাফেরা প্রভৃতি অনৈতিক কাজ কর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাদেরকে গুরুগৃহে পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করতে হতো।

অনেক সময় দেখা যেত গুরুরা তাদের মহামূল্যবান্ দৈবিক অস্ত্রের জ্ঞান শিষ্যদের দিতেন যাতে তারা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। এই জ্ঞান পাবার জন্য ছাত্রদের অনেক পরিশ্রম করতে হত। যোগ্য শিষ্যদেরকেই গুরু কেবলমাত্র দৈবিক অস্ত্র প্রদান করতেন। বৈদিক যুগে শিক্ষাদানের জন্য কোন লিখিত পুস্তক ছিল না। শিক্ষাপদ্ধতি ছিল আবৃত্তি মূলক। বৈদিক যুগে পঠন-পাঠনের মূল বিষয় ছিল যজ্ঞের মন্ত্র। বৈদিক যুগে মৌখিক পঠন-পাঠনের বেশি ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়াও গুরু অনেক সময় শিক্ষাদান আলোচনার মাধ্যমে করতেন। শিক্ষক বা আচার্য যথাযথ ছন্দ এবং ধ্বনিতে মন্ত্র উচ্চারণ

করতেন এবং ছাত্র বা শিষ্যরা তা শুনে মনন ও অনুধাবনের সঙ্গে আয়ত্ত করত। বেদ শিক্ষাগ্রহণে অনেক সময় লাগতো। সাধারণত শ্রাবণ পূর্ণিমাতে শিক্ষা আরম্ভ হত। অমাবস্যা-পূর্ণিমা, ঝড়-বৃষ্টি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কারণে শিক্ষাদান বন্ধ থাকতো। গুরু শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের ভয় দেখিয়ে খেতে না দিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। দৈহিক শাস্তি দানের ব্যবস্থা ছিল না। চরম অবস্থায় গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কার করা হতো। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। শ্রবণ-গুরু যা বলতেন তা মন দিয়ে শুনতে হতো। মনন-গভীরভাবে চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন-একাগ্রভাবে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হতো বৈদিক যুগে। বৈদিক যুগে শিক্ষা শেষ হবার পর পরীক্ষা নেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আলোচনা সভা বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হতে হত শিক্ষার্থীকে। এরপর শিক্ষা শেষ হলে সমাবর্তন নামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের স্নাতক বলে ঘোষণা করা হত। এরপর গুরুর কাছ থেকে মহা মূল্যবান উপদেশ নিয়ে শিক্ষা শেষ করে নিজেদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতেন শিক্ষার্থীরা।

গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১) অধ্যাপক যুধিষ্ঠির গোপ, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি বুক ডিপো, কলকাতা, আগস্ট-২০০৩।

২) শ্রী নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৩) শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী, বৈদিক ভারত, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৫ এপ্রিল ১৯৯০।

৪) শ্রী নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শিক্ষার ইতিহাস ও আধুনিক শিক্ষা-সমস্যা, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।

৫) Dr. Jayanta Mete, HISTORY OF EDUACTION IN IDNIA, Tripura University, 2016.

ভারতীয় সমাজে নীতিকথার প্রভাব

সোনিয়া আগরওয়াল

সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

উচিৎ সময়ে উচিৎ স্থানে উচিৎ কার্য করার প্রক্রিয়াকেই সাধারণত নীতি বলে। নীতি অনেক ভেবে চিন্তে তৈরি করা সিদ্ধান্তের প্রণালী যা উচিৎ সিদ্ধান্ত নির্ণয় এবং সম্যক পরিণাম পেতে সাহায্য করে। নীতিতে অভিপ্রায় এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। নীতিকে একটি প্রক্রিয়া বা ন্যায়াচারের মত ব্যবহার করা হয়।

নীতি কাব্যের উদ্ভব হিসেবে বিশ্বসাহিত্য এর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেবেদ কে মানা হয়। এছাড়াও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদ্, রামায়ণ-মহাভারত এবং ধর্ম নীতির সু-উপদেশ সমূহ সম্মিলিত আছে। এই সমস্ত নীতিশাস্ত্রগুলিতে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান এবং বৈরাগ্য এর সুন্দরভাবে সন্নিবেশ রয়েছে এই গ্রন্থগুলিতে প্রায় সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসীদের উল্লেখ এবং উপদেশ সমূহ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলিতে সমাজ জীবনে ব্যবহৃত নীতির প্রয়োগ রয়েছে যা মানুষকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করবে, এছাড়াও এগুলি জীবনের অসারতার নিরূপণ করে মানবকে মোক্ষলাভের পথে পরিচালিত করে। ভারতীয় নীতির অন্তর্গত ধর্ম এবং দর্শনও সমাহিত হয়। এই জন্য নীতি কাব্যের উৎস, স্মৃতি গ্রন্থকেও মানা হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং বিদূরনীতি তো স্বয়ংই নীতিকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষামূলক গ্রন্থ যার থেকে আমরা জীবনের অসারতা, আত্মার অমরতা, নিষ্কাম কর্মবাদের শিক্ষা লাভ করি। এইভাবেই বিদূর নীতি থেকে কুল ধর্ম, রাজ ধর্ম, স্বধর্ম প্রভৃতি শিক্ষা পায়।

নীতকাব্যের সর্বপ্রথম সংগ্রহ "চাণক্য সংগ্রহ"। এটি "চাণক্য নীতি" নামেও পরিচিত। এতে ব্যবহার সম্বন্ধী পদ্যের সাথে রাজনীতি সম্বন্ধী শ্লোকের উদ্ভবও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই নীতি বিষয়ক সদুপদেশ সম্বন্ধ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রখ্যাত গুরু অমাত্য চাণক্যের সাথে যুক্ত কিন্তু এটি স্পষ্ট হয়নি যে এটির লেখক অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা চাণক্যই। চাণক্য রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতির প্রয়োগের উপদেশ দিতেন। হতে পারে চাণক্য এক মহান্ রাজনীতিবেত্তা হওয়ার কারণে এটি "চাণক্য সংগ্রহ" এরূপ নামকরণ হয়েছে।

চাণক্য নীতি শাস্ত্রকে সমস্ত শাস্ত্রের বীজ বলা হয়েছে -

"নানা শাস্ত্রেদ্ধৃতং রাজনীতি সমুচ্চয়ম।

সর্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্য সারসংগ্রহং।। ”

(অনুষ্টুপ ছন্দ ১০৮) চাণক্য নীতি শাস্ত্র।

নীতকাব্য সাধারণত নিরস, শিক্ষামূলক শাস্ত্র হয়ে থাকলেও এর থেকে শিক্ষা মানুষকে সঠিক মার্গে পরিচালিত করে। সাধু-অসাধু বিচার করতে শেখায়। কবি ভর্তৃহরি বিরচিত “নীতিশতক” গ্রন্থটি নীতি কাব্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে রয়েছে। এই কাব্যটিতে কবি ভর্তৃহরি অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষা দিয়ে নিজের অনুভবকে প্রস্তুত করেছেন। মানব জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যেকটি বিষয় এই গ্রন্থে রয়েছে। কবির মতে আসল মানব তারাই যারা সবসময় চিত্তসুখে থাকেন, পরমানন্দে থাকেন। তিনি মূর্খদের বর্ণনা করেছেন নিজের শ্লোকের মধ্য দিয়ে এবং তাঁদের রোগ নিরাময় যে সম্ভব নয় সেটাও দেখিয়েছেন। এছাড়াও কবি খুব সুন্দর করে বিদ্বান্‌দের প্রশংসা করেছেন। কবির এই রচনা থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নীতি প্রাপ্ত করি। যেগুলি অনুসরণ করলে আমাদের জীবন অত্যন্ত শান্তির সহিত ব্যতীত হবে। তিনি এক দিকে কর্ম সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন আবার ভাগ্যকেও দেখেছেন।

কয়েকটি বিষয়ে ওনার ধারণা আজও সত্য প্রতীত হয়। যথাঃ – এই সংসারে সবকিছুর ঔষধ পাওয়া গেলেও মূর্খদের নয়।

“সর্বৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নস্তৈষধোম।।”

আত্মবিবেকের পরিত্যাগ করা মানুষের পতন শত প্রকারে হয়। যথা – ‘বিবেক ভ্রষ্ঠানং ভবতি বিনিপতঃ শতমুখঃ।” (নীতিশতক শ্লোক, ১০)

আভূষণের দ্বারা মানুষ কখনো সুসজ্জিত হয় না। প্রকৃত আভূষণ তো সুসংস্কৃত বাণীই।

“বাণয়েকাষ সমলংকরোতি পুরুষং যা সংস্কৃতর্ধায়তে।

ক্ষীয়ন্তে খলুভূষণানী সততাহবাগভূষণম্।।”

(নীতিশতক)

নীতিশাস্ত্রের প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে কবি বিষ্ণু শর্মা। প্রায় ২০০-৩০০ বছর পূর্বে “পঞ্চতন্ত্র” নামক কাহিনীগুলির দ্বারা এক রাজার তিন জন বোকা পুত্রদের শিক্ষাদান এবং সঠিক মার্গ দর্শন করান। তাঁর শিক্ষাদান সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি পঞ্চতন্ত্রকে কাহিনী রূপে সংকলিত করেন। তিনি ওই রাজপুত্রগুলিকে গল্পের মাধ্যমে জীবনের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন নীতিশিক্ষা দান করেন। এই গল্পগুলিতে বিভিন্ন পশু, পাখি, গাছপালার উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে থাকে এবং প্রত্যেকটি গল্পের শেষে একটা শিক্ষাদানমূলক নীতি কথা থাকে।

এই গ্রন্থগুলো থেকে মানুষ যেমন অসারতা দূর করে তেমনি জীবনে চলার পথে অনেক নৈতিকতার শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারে। মানুষের মধ্যে মানসিক মূল্যবোধ এর অভাব দেখা দিলে তাঁরা এই গ্রন্থগুলো পড়ে নিজেদের সঠিক মার্গে পরিচালিত করতে পারে, এবং অন্যকেও জীবনে চলার পথে সঠিক পথ দেখাতে পারে। মানুষ যে হঠকারিতার মধ্যে অনেক সময় মূর্খদের মতো আচরণ করে থাকে সেটি আমরা নারায়ণ শর্মার "হিতোপদেশ" নামক গ্রন্থের একটি ব্রাহ্মণ ও নকুল এর গল্প থেকে জানতে পারি।

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন নীতিকাব্যগুলি ভারতের মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবনে চলার পথে ব্যবহার করে আজ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই সমস্ত কাব্যগুলি শুধুমাত্র ভারতেই নয় জনমানসে অনেক প্রভাব ফেলেছে। মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে এই নীতিগুলি অনুসরণ করে উন্নতি সাধন করেছেন। ভারতের মাটিতেই এই গ্রন্থগুলির উদ্ভব হেতু ভারত বিশ্ববরেণ্য স্থানে রয়েছে।

আমরা এই নীতিকথাগুলি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে চললে আমরাও সঠিক মার্গে পরিচালিত হবো। এর থেকে বোঝা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নীতি কথার গুরুত্ব অনেক ছিল এবং বর্তমানেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রন্থপঞ্জি

১. নীতিশতকম্ সঞ্জীব কুমার সাধুখাঁ ও সাধনা সরকার, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮

২. বনবিহারী ঘোষাল সংস্কৃত নির্দেশিকা। রবীন্দ্র লাইব্রেরি প্রা. লি., ২০০৫

৩. রাজেস্ব মিশ্র চাণক্যনীতি। ডায়মন্ড বুকস, ২০১৭

৪. V. Sharma Bibliographic information -Rupa & Company, 1991.

ক্রোধঃ প্রীতিং প্রন্ধশয়তি মানো বিনয়নাশনঃ।
মায়া মিত্রাণি নাশয়তি লোভঃ সর্ববিনাশনঃ।।

ভারবি ও তাঁর কিরাতার্জুনীয়ম্ এর বিবরণ

তমা মণ্ডল
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

ভূমিকা :

কালিদাসোত্তর মহাকাব্য যুগের উজ্জ্বল রবিকবি ভারবি। তাঁর আবির্ভাব কাল ৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। কিরাতার্জুনীয়ম্ কালিদাসোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য যার রচয়িতা মহাকবি ভারবি। ভারবি কৌশিক গোত্রীয় নারায়ন স্বামীর পুত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা আনন্দপুর এর অধিবাসী ছিলেন। কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্য ভারবির একমাত্র রচনা। এই রচনার জন্য তিনি অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

কিরাতার্জুনীয়ম্ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

মহাভারতের (বনপর্বের অন্তর্গত) একটি ক্ষুদ্রাকার কাহিনী ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্। অবশ্য শিবপুরাণেও এ কাহিনী আছে; তবে অনুমান করা যায় যে ওই পুরাণ ভারবির পরবর্তীকালের রচনা।

কাহিনী সংক্ষেপে :

প্রথম সর্গ – দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কাছে বনেচরবেশী দূত কর্তৃক দুর্যোধনের সুষ্ঠু রাজ্যশাসন পদ্ধতির বর্ণনা; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভাইদের কাছে দুর্যোধনের সুশাসনের পরিচয়দান; পঞ্চপান্ডবের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দ্রৌপদীর ক্ষোভ এবং কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান।

দ্বিতীয় সর্গ - ভীম কর্তৃক দ্রৌপদীর সমর্থন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভাষণে অগ্রিম যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমের প্রশংসা কিন্তু অগ্রিম যুদ্ধ ঘোষণায় অনীহা প্রকাশ; ব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক সম্বর্ধনা।

তৃতীয় সর্গ – ব্যাসদেব জানালেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মহাবিদ্যার প্রয়োজন; তাঁর পরামর্শে মহাবিদ্যা অর্জনের জন্য অর্জুনের ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা আচরণের উদ্দেশ্যে গমন।

চতুর্থ সর্গ – জলে –স্থলে আকাশে শরৎ শোভার সমারোহ বর্ণনা।

পঞ্চম সর্গ – যক্ষ কর্তৃক ইন্দ্রনীল পর্বতে আগত অর্জুনকে হরপার্বতীর অধিষ্ঠান জ্ঞাপন এবং কঠোর তপস্যার জন্য অনুরোধ।

ষষ্ঠ থেকে স্বর্গ – অর্জুনের তপস্যার বিঘ্ন উদযাপনের জন্য গন্ধর্ব অপ্সরাদের ইন্দ্রকীল পর্বতে আগমন; তাদের বনবিহার ও জলকেলি বর্ণনা।

নবম থেকে দশম স্বর্গ – অপ্সরা গন্ধর্বদের মদিরাপান ও কামকৌতুক প্রভাত বর্ণনা; অপ্সরাদের ছলা-কলা দ্বারা অর্জুনকে প্রলোভনের চেষ্টা, অবশেষে ব্যর্থকাম হয়ে স্বর্গে প্রস্থান।

একাদশ স্বর্গে – মুনির ছদ্মবেশে ইন্দের অর্জুনসকাশে আগমন, পরস্পরের কথোপকথন এবং ইন্দ্র কর্তৃক অর্জুনকে আশীর্বাদ ও মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যার পরামর্শদান।

দ্বাদশ স্বর্গে – অর্জুনের তপস্যায় ভীত ঋষিদের মহাদেবসকাশে যাত্রা, পরস্পরের কথোপকথন এবং অর্জুন এর উদ্দেশ্যে বর্ণনা; মহাদেব কর্তৃক ভবিষ্যতের কাহিনী নিবেদন।

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশস্বর্গ : বরাহবেশে মূক দানব কর্তৃক অর্জুনকে আক্রমণ; কিরাতবেশী মহাদেব কর্তৃক বরাহকে আক্রমণ; কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জুনের যুদ্ধ; অর্জুনের বানবর্ষণে কিরাত সৈন্যদের রণভঙ্গ এবং পুনরায় যুদ্ধ।

ষষ্ঠাদশ থেকে সপ্তদশ স্বর্গে : শিবের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের ফলে অর্জুনের পরাভব; বৃক্ষ-প্রস্তরাদির সাহায্যে অর্জুনের যুদ্ধ প্রচেষ্টা।

অষ্টাদশ স্বর্গে : কিরাতরূপী শিব ও অর্জুনের মুষ্টিযুদ্ধ; শিবের স্বরূপের আত্মপ্রকাশ; অর্জুনের কর্তৃক মহাদেবের বন্দনা; মহাদেব কর্তৃক অর্জুনকে পাশুগত অস্ত্রদান।

কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের ৩০টির অধিক টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য টীকাকারগণ হলেন – মল্লিনাথ, মঙ্গল, রামচন্দ্র, প্রকাশ বর্ষ, চিত্রভানু, একনাথ, হরিকণ্ঠ, ভরতসেন, শ্রীকণ্ঠ, কৃষ্ণকবি, দেবরাজ্যভট্ট, রবিকীর্তি প্রভৃতি।

ভারবির কৃতিত্ব – ভারবির যুগ থেকেই কৃত্রিম আড়ম্বর বহুল গুরুভার রচনায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয়; এযুগে শাস্ত্রকাব্যর বৈদগ্ধ্য, ভাষার ঐশ্বর্য, বর্ণনায় বহুমুখী বৈভব ভারবির মহাকাব্য রচয়িতার অতিমাত্রায় সচেতন। এরূপ কাব্য রচয়িতারা অতিমাত্রায় সচেতন। এরূপ কাব্য পাঠের জন্য পণ্ডিত পাঠককে যে বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় সে কথা উল্লেখ করেছেন প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ। মল্লিনাথ এর মতে ভারবির ভাষা নারকেলের তুল্য আপাত রুক্ষ, কিন্তু পরিণামে অতিশয়

সারবান্ ও রমনীয়। জটিল বাগ্ বিন্যাস, কৃত্রিম রচনায় পদ্ধতি, অলংকারের চাতুর্য প্রভৃতি মিলে তার কাব্যের দৃঢ় ভিত্তি তৈরি। কবি স্বয়ং কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে আপন রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুধী পাঠককে অবহিত করেছেন; যেমন অর্জুন ইন্দ্রের ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন – 'আপনার বাক্য সারার্থযুক্ত, সমাসবহুল, অর্থগৌরবে মহৎ, অতিশয্যবর্জিত, যথাযথ অর্থের প্রতিপাদক, সংকীর্ণতা মুক্ত সমুদ্রের মত গুরুগম্ভীর। মহাকাব্য রচনা দ্বিতীয় পর্বে বহিরঙ্গ মণ্ডনকলা আর শব্দ অর্থ ঘটনার ঘনঘটা দিয়ে যে কঠোর আয়াসসাধ্য সাহিত্যসজ্জনার ক্রান্তিকাল, তার পথিকৃৎ সম্ভবতঃ ভারবি; তাই অতি-সাহসী সমালোচকেরা সাদরে আপ্যায়ন জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন – 'নতুন যুগের সূর্য' বলে।

উপসংহার :

নাটকীয় বাচনভঙ্গি, সারগর্ভ উক্তি অজস্বী ছন্দ – অলংকার এর নৈপুণ্য, স্বচ্ছন্দ রচনারীতি প্রভৃতি সবই সুকবির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। ভারবি তাঁর পরবর্তী মহাকাব্যকারদের (মাঘ, শ্রীহর্ষ, শিবস্বামী প্রভৃতি) মতোই কখনো কখনো দুর্বোধ্য, টীকাকারের ব্যাখ্যা তব্য কিন্তু সাধারণভাবে তিনি সার্থক কবি। তাঁর অর্থগৌরব পাণ্ডিত্যের দর্প নয়, হৃদয়ের আকর্ষণ। অর্থগৌরব প্রমাণ করতে তাঁর অনেক উক্তি আমরা উদাহরণ দিতে পারি -

১। হিতং মনোহারি চ দুর্লভ বচঃ

২। সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদং পদম্

৩। বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা বস্তুনি।

বাতাসে ভাসন্ত পদ্মের পরাগজালকে সোনার ছাতা কল্পনা করে কবি আতপত্র ভারবি বা 'ছত্র ভারবি' এই বিশেষ আখ্যায় পরিচিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪১৯।

২) বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

৩) বসু অনিলচন্দ্র, কিরাতার্জুনীয়ম্, সংস্কৃত বুক ডিপো।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

শুচিস্মিতা পাল
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভারতীয় জনজীবনে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' বা সংক্ষেপে 'ভগবতগীতা' বা 'গীতা' এক গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। মহাভারতের ভীষ্মের ২৫ তম অধ্যায় থেকে ৪২ তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১৮টি অধ্যায়ে বিবৃত অংশ হলেও স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে এটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

বর্তমানে শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় ৭০০টি শ্লোক পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে— অর্জুন বিষাদ-যোগ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে— সাংখ্য যোগ, তৃতীয় অধ্যায়ে— কর্মযোগ, চতুর্থ অধ্যায়ে— জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, অষ্টম অধ্যায়ে— অক্ষর ব্রহ্ম যোগ, নবম অধ্যায়ে— রাজ যোগ, দশম অধ্যায়ে— বিভূতি যোগ, একাদশ অধ্যায়ে— ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ, চতুর্দশ অধ্যায়ে— গুণত্রয় বিভাগ যোগ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে— পুরুষোত্তম যোগ, ষোড়শ অধ্যায়ে— দৈবাসুর-সম্পদবিভাগ যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়ে— শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ, এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে— মোক্ষ যোগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের মুখে ৫৭৪টি শ্লোক, অর্জুনের মুখে ৮৫টি শ্লোক, সঞ্জয়ের মুখে ৪০টি শ্লোক ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে ১টি শ্লোক উক্ত হয়েছে।

গীতা অধ্যায় :

গীতা ৭০০টি শ্লোক নিয়ে ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

১. অর্জুন বিষাদ-যোগ : কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সেনা পর্যবেক্ষণ : রণাঙ্গনে প্রতীক্ষমান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে দেখলেন যে প্রতিপক্ষের সকলেই তার আত্মীয়স্বজন— তাদের উপর তিনি অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবেন না এই কথা বলে তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেন।

২. সাংখ্য যোগ : শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শিষ্য অর্জুন আত্মসমর্পণ করেন এবং অনিত্য জড় দেহ ও শাশ্বত চিন্ময় আত্মার মূলগত পার্থক্য নির্ণয় এর মাধ্যমে অর্জুনকে কৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করতে শুরু করেন। দেহান্তর প্রক্রিয়া পরমেশ্বর এর উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবার প্রকৃতি এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

৩. কর্ম যোগ : এই জড় জগতে প্রত্যেককেই কোনও না কোনও ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু কর্ম সকল মানুষকে এই জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করতেও পারে, আবার তা থেকে মুক্ত করে দিতেও পারে। স্বার্থচিন্তা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজের মাধ্যমে, মানুষ তার

কাজের প্রতিক্রিয়া জনিত কর্মফলের বিনিময় থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং আত্মতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব বিদ্যাজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন।

৪. জ্ঞানযোগ : এই প্রকার জ্ঞান হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভক্তিমূলক কর্মের স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান গীতার সুদীর্ঘ ইতিহাস, জড় জগতে যুগে যুগে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ গুরুর সান্নিধ্য লাভের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

৫. সন্ন্যাস যোগ : বহির্বিচারে সকল কর্তব্যকর্ম সাধন করলেও সেগুলির কর্মফল পরিত্যাগ করার মাধ্যমে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরমার্থিক জ্ঞানতত্ত্বের অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধি লাভ করে থাকেন, ফলে শান্তি, নিরাসক্তি, চিন্ময় অন্তর্দৃষ্টি এবং শুদ্ধ আনন্দ লাভ করেন।

৬. জ্ঞান যোগ : নিয়মতান্ত্রিক ধ্যানচর্চার মাধ্যমে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন মন ও ইন্দ্রিয় আদি দমন করে এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট রাখে। এই অনুশীলনের পরিণামে পরমেশ্বরের পূর্ণ ভাবনারূপ সমাধি অর্জিত হয়।

৭. জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, সর্বকারণের পরম কারণ এবং জড় ও চিন্ময় সর্ববিষয়ের প্রাণশক্তি। উন্নত জীবাত্মাগণ ভক্তি ভরে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন, পক্ষান্তরে অধার্মিক জীবাত্মারা বিষয়ের ভজনায় তাদের মন বিক্ষিপ্ত করে থাকে।

আজীবন কৃষ্ণের চিন্তার মাধ্যমে এবং বিশেষ করে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করে, জড় জগতের ঊর্ধ্বে ভগবানের পরম ধাম লাভ করতে পারে।

৯. রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ : কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং পরমারাধ্য বিষয়। অপ্রাকৃত ভগবত-সেবার মাধ্যমে জীবাত্মা মাত্রই তার সাথে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। মানুষের শুদ্ধ ভক্তি পুনরুজ্জীবিত করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব।

১০. বিভূতি যোগ : সর্বকারণের পরম কারণ, সর্ববিষয়ের আশ্রয় ও সারাতিসার রূপে কৃষ্ণ সর্বজীবেরই পরমারাধ্য বিষয়।

১১. বিশ্বরূপ দর্শন যোগ : কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক তাঁর অনন্ত বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। এভাবেই তিনি তার দিব্যতত্ত্ব অবিসংবাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে, তার স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্যময় মানবরূপী আকৃতিই ভগবানের আদিরূপ। একমাত্র শুদ্ধ ভগবত-সেবার মাধ্যমেই মানুষ এই রূপের উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম।

১২. ভক্তিযোগ : চিন্ময় জগতের সর্বোত্তম প্রাপ্তি বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভের পক্ষে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। যারা এই পরম পন্থার বিকাশ নিয়োজিত থাকেন, তারা দিব্য গুণাবলীর অধিকারী হন।

১৩. ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ : দেহ, আত্মা এবং উভয়েরও উর্ধ্বে পরমাত্মার পার্থক্য যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হন।

১৪. গুণত্রয় বিভাগ যোগ : সমস্ত দেহধারী জীবাত্মা মাত্রই সত্ত্ব, রজ ও তম— জড় প্রকৃতির এই ত্রিগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন। পরমেশ্বর কৃষ্ণ এই ত্রিগুণাবলীর স্বরূপ, আমাদের ওপর সেগুলির ক্রিয়াকলাপ, মানুষ কিভাবে সেগুলিকে অতিক্রম করে এবং যে মানুষ অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত তার লক্ষণাবলী ব্যাখ্যা করেছেন।

১৫. পুরুষোত্তম যোগ : বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে মানুষ কৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে, সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

১৬. দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ যোগ : যারা আসুরিক গুণগুলি অর্জন করে এবং শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করে থাকে, তারা হীনজন্ম ও ক্রমশ জাগতিক বন্ধনদশা লাভ করে। কিন্তু যারা দিব্য গুণাবলীর অধিকারী এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি মেনে বিধিবদ্ধ জীবন যাপন করেন, তারা ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করেন।

১৭. শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ : জড় প্রকৃতির ত্রিগুণাবলীর থেকে উদ্ভূত এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রদ্ধা তিন ধরণের হয়ে থাকে। যাদের শ্রদ্ধা রাজসিক ও তামসিক, তারা নিতান্তই অনিত্য জড়-জাগতিক ফল উৎপন্ন করে। সত্ত্বগুণময় কার্যাবলী হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে এবং পরিণামে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পথে মানুষকে পরিচালিত করে ভক্তিভাব জাগ্রত করে তোলে।

১৮. মোক্ষযোগ : কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন ত্যাগের অর্থ এবং মানুষের ভাবনা ও কার্যকলাপের উপর প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতিক্রিয়াগুলি কেমন হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ব্রহ্ম উপলব্ধি, ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য ও চরম উপসংহার-ধর্মের সর্বোচ্চ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, যার ফলে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ হয়, সম্যক জ্ঞান-উপলব্ধি অর্জিত হয় এবং শাশ্বত চিন্ময় পরম ধামে প্রত্যাবর্তন করা যায়।

উৎকৃষ্ট দার্শনিক তত্ত্বসমন্বিত গ্রন্থ হিসেবে 'গীতা' অতুলনীয় 'গীতা'র কর্মযোগ ভারতাত্মার মর্মবাণী। যুদ্ধের পরিণাম মৃত্যুতেও শোক করা উচিৎ নয়। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ

করে, ঠিক তেমনই আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। কর্মফল নাশ করার উপায় সম্বন্ধে গীতার বাণী "জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন"। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমস্ত কর্মফল নাশ হয়ে যায়। আর তিনিই জ্ঞান লাভের অধিকারী, যিনি শ্রদ্ধাবান্। এই কথাই 'গীতা'র বাণীতে উচ্চারিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সাধুখাঁ, ডক্টর রঞ্জিত কুমার, সংস্কৃত শিক্ষক (একাদশ শ্রেণী) ছায়া প্রকাশনী প্রা.লি. কলকাতা, ২০১৭

২. ঘোষাল, বনবিহারী, উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত নির্দেশিকা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী প্রা.লি., কলকাতা, ২০১৮

৩. গোস্বামী মহারাজ শ্রীধর দেব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ, ১৯৯৬

৪. Bhaktuvedanta, Swami Prabhupad A.C., Bhagavad Gita as it completed with original Sanskrit text, collier Books, 1972.

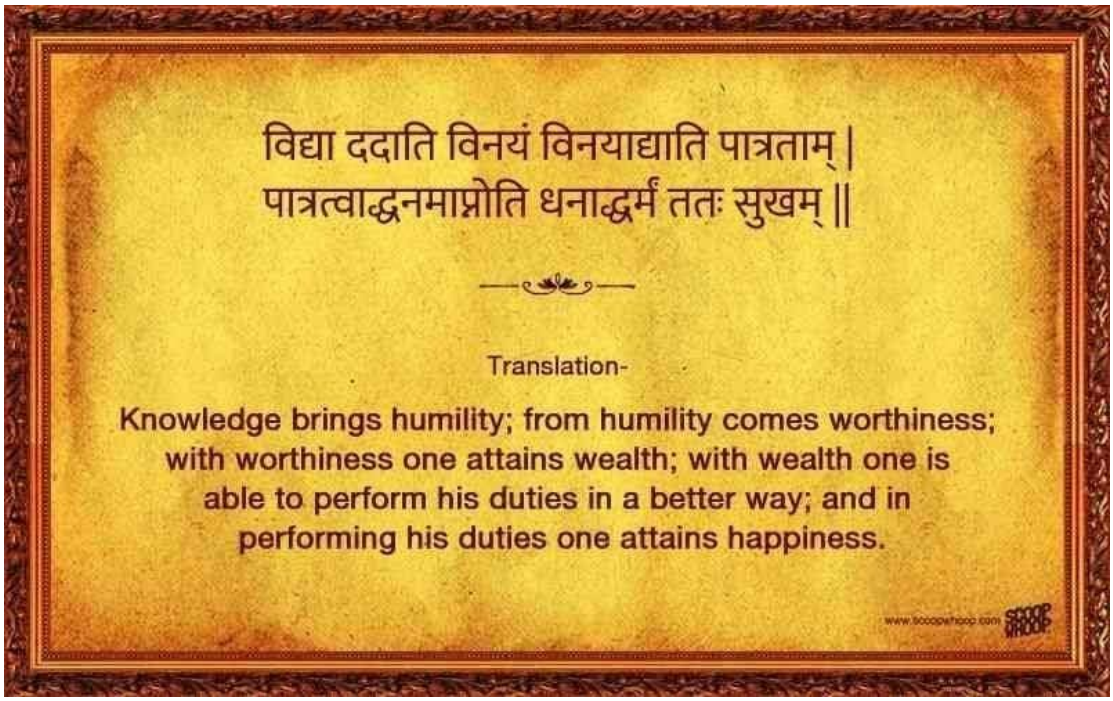

কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি

সুস্মিতা শীল
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

কালিদাস জীবনের কবি প্রাণের কবি। জীবন প্রাণ-প্রকৃতিরই তাই কালিদাসের যে কোনো সাহিত্যে প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলা তো প্রকৃতি মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। শকুন্তলা পতিগৃহে যাবার সময় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া কবির ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উদ্‌গলিতদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপান্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূনীব লতাঃ।।

রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রকৃতির সগর্ব উপস্থিতি উপযুক্ত অবসরে কবি বর্ণনা করেছেন। এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গ তার ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য প্রথম সর্গের প্রকৃতি চিত্রগণের অবকাশ সীমিত।

এই সীমিত পরিসরে ও উপযুক্ত অবসরে প্রকৃতি যথাপোযুক্ত মর্যাদায় চিত্রিত। প্রথম সর্গের বিষয়ে অনবদ্য তার দোষ নিবারণের জন্য মহারাজ দিলীপ রাজমহিষী সুদক্ষিণার বশিষ্ঠাশ্রম গমন। রাজদম্পতি সুদৃশ্য রথে চলেছে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমের প্রতি। তাদের যাত্রা পথের দু'ধারে চলমান সৌন্দর্যের চিত্রকল্প। শাল নির্যাসের গন্ধে আমোদিত, পুষ্পরেণুশোভিত অনুকূল বায়ু রাজদম্পতির সেবায় নিয়োজিত।

সেব্যমানৌ সুখস্পর্শে শালনির্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণূৎ কিরৈবাতৈরাধূতবনরাজিভিঃ।।

রাজদম্পতি রথে পাশাপাশি উপবিষ্ট। কবির মনে হল এ যেন বর্ষার আকাশে বিদ্যুৎ আর মেঘের সংযোগ। তাঁদের রথের মন্দ্রমধুর ধ্বনিতে মেঘ গর্জন অনুমান করে ময়ূর ময়ূরী মার্গসংগীতের ষড়জ সুরের ন্যায় মনোরম কেকাধ্বনিতে মেতে উঠলো। ষড়জ সংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ। বনের ভিতর দিয়ে রাজা রানীর রথ চলেছে। মুগ্ধ মৃগমিথুন দলবদ্ধ হয়ে সেই রথের দিকে তাকিয়ে আছে। রাজা রানী ও মৃগমিথুন দৃষ্টিতে পরস্পরের দৃষ্টি সাদৃশ্য লক্ষ্য করে পুলকিত হচ্ছেন। প্রকৃতির জল স্থান অন্তরিক্ষের সমন্বয়েই রচিত। কবি সৌন্দর্য লেখা সর্বত্রই প্রকাশিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হংস শ্রেণি সারিবদ্ধভাবে মালিকার ন্যায় কুলায়ে প্রত্যাবর্তন করে। হংস শ্রেণী নিনাদ মুখর। রাজদম্পতি স্তম্ভহীন তোরণ মালার সদৃশ হংস শ্রেণীকে মুখ তুলে দেখলেন।

সারসৈঃ কলহিহ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ।

রাজদম্পতি সন্তান লাভের আশায় কুলগুরুর আশ্রমে যাচ্ছেন। বায়ুর অনুকূল্য সূচনা করে কবি তাঁদের উদ্দেশ্য পূরণের বার্তা দিলেন। কালিদাসের প্রকৃতি মানুষের সহচর। তাই কল্যাণ পথযাত্রী রাজদম্পতিকে কবি বসন্ত পূর্ণিমার রাতের আকাশের চিত্রা নক্ষত্র ও চন্দ্রের উপমায় উপমিত করে, কল্যাণ প্রাপ্তির ইঙ্গিত দিলেন।

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।

হিমনিমুক্তয়োষোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।

সন্ধ্যা দিনমানের অত্যন্ত রমনীয় সময় দিবসাঃ পরিণাম রমনীয়াঃ। এই রমণীর সন্ধ্যায় কবি রাজ দম্পতিকে কুলগুরুর আশ্রমে উপস্থিত করেছেন। কবি রাজদম্পতির চোখ দিয়ে আশ্রম প্রকৃতিরও মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীগণ সারাদিন অরণ্য থেকে সমিৎ, কুশ ও আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে। দিনান্তে আশ্রমে ফিরে আসেন। ব্রহ্মচারী বালকদের এই প্রত্যাবর্তনের যজ্ঞীয়াগ্নি সমিৎ কুশের লোভে যেমন অদৃশ্যভাবে তাঁদের অনুগমন করেন, তেমনি আশ্রমমৃগ নীবারধান্যের লোভে দৃশ্যভাবে। কী অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্র। আশ্রমের জলচর পক্ষীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আশ্রম বালিকাগণ জলসেচনে সম্পন্ন করেই জলাধারের কাছ থেকে সরে পড়েছেন। মৃগকুল আশ্রম প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে রোমন্থন করছে। মহাকাব্যের প্রথম সর্গের এই সল্প পরিসরে কবি এই ভাবেই প্রকৃতি মানব সম্পদ রচনা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) চক্রবর্তী শ্রীসত্যনারায়ণ, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কোলকাতা – ৭০০০০৬৬, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৮

২) ভট্টাচার্য্য পার্বতীচরণ, মেঘদূত পরিচয়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কোলকাতা – ৬, মুদ্রণ ৩২, মদনমিত্র লেন, কোলকাতা

৩) মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কোলকাতা

"কর্ম ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানযোগের ভূমিকা"

রিমা সরকার
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী, যা মহাভারতের যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। এই গীতার উপদেশের মধ্যে আমাদের সকলের জীবনের পরম কল্যাণ কিভাবে সাধিত হবে তা বর্ণনা করা আছে। "জ্ঞানযোগ" অধ্যায়টি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ নম্বর অধ্যায়। এই অধ্যায়টির নাম থেকে মনে হতে পারে যে এখানে হয়তো শুধু জ্ঞানের কথাই আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়ে জ্ঞান বিষয়ক কথাই আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়ে জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় যেমন— অবতারতত্ত্ব, নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে মোট ৪২টি শ্লোক রয়েছে। জ্ঞানযোগ হল নাম ও রূপের বাইরে গিয়ে পরম সত্যকে উপলব্ধি করা। জ্ঞানযোগ অনুসারে এই উপলব্ধির মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অবতার তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন –

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।"
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।।"

অর্থাৎ, হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন— যিনি আমাদের এই অলৌকিক দিব্য জন্ম ও সাধুপরিত্রাণাদি অপ্রাকৃত কর্মতত্ত্ব জানেন, তিনিই আমাকে লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন। আশক্তিরহিত, ভয়শূন্য ও ক্রোধবর্জিত ও আমারই শরণাগত ব্যক্তি জ্ঞান রূপ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। তিনি আরো বলেন— যিনি যে প্রকারে আমার উপাসনা করেন আমি তাকে সেইরূপ ফল প্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি, ধর্মনিষ্ঠ মানুষ সকল প্রকারেই আমারই পথের অনুসরণ করেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, মানুষের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—

কর্ম ও অকর্ম কাকে বলে আমি সেই বিষয়ে তোমাকে উপদেশ করব। তুমি তা অবগত হয়ে সমস্ত অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত হবে। কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।

যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন, তিনি সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও সেই কর্মের জন্য আবদ্ধ হন না। আত্মজ্ঞ পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করেন কর্মের জন্য, কর্মফলের জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন— তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকো, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে। প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কষ্টকে ভস্মসাৎ করে, তেমনি জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে। এই জগতে চিন্ময় জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ক ফল। ভগবদ্ ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন তিনি কালক্রমে আত্মার প্রশান্তি লাভ করেন। অতএব, হে ভারত! তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞান প্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে, জ্ঞান রূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন করো। যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।

ভগবদ্গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে, অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) সাধুখাঁ, ডক্টর রঞ্জিত কুমার, সংস্কৃত শিক্ষক (একাদশ শ্রেণী), ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭

২) ঘোষাল, বনবিহারী, উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত নির্দেশিকা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ২০১৮

৩) গোস্বামী মহারাজ শ্রীধরদেব, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ, ১৯৯৬

লোক সচেতনতায় উপনিষদের অবদান

সোমা মুখার্জী
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বেদকে আশ্রয় করে উপনিষদ্‌গুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বেদের যজ্ঞকে কেন্দ্র করে যে আনুষ্ঠানিক পর্ব গড়ে উঠেছে তা থেকে উপনিষদ্‌কে পৃথক করবার জন্য তাকে কর্মকাণ্ড বলে সূচিত করে উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়েছে। বেদের মধ্যেই যেন দুটির ধারা পাশা পাশি গড়ে উঠেছিল— একটি বৈদিক দেব-দেবীর স্তুতি নিবেদনে ব্যাপৃত, অন্যটি বিন্ধ্য-রহস্যকে ভেদ করবার আকৃতি হতে সঞ্জাত তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণা, এই জ্ঞানতৃষ্ণাই আরণ্যক যুগে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং বিশুদ্ধ দার্শনিক জ্ঞানের সম্পন্ন আত্মনিয়োগ করেছিল। তারই পরিণতি হল উপনিষদ্‌।

উপনিষদ্‌-এর অর্থ কি তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ডয়সেন বলেন— তা হল রহস্যগত জ্ঞান। ম্যাক্সমূলার বলেন, গুরুর নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করা হত বলে তার এই নাম। বলা বাহুল্য ব্যাখ্যা আরও সহজ হতে পারে। বেদের প্রান্তে বেদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল বলে তাকে উপনিষদ্‌ বলা হয়। বেদান্তকে উপনিষদের সমর্থকবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরকালে পরম গুহ্য এই তত্ত্বটি প্রচারিত হয়েছে।

কর্মকাণ্ড হতে পৃথক্‌ করবার জন্য উপনিষদ্‌কে পরাবিদ্যা বলা হয়েছিল, মুন্ডক উপনিষদে পরা ও অপরা বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। তারপর অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় পড়ে চারটি বেদ এবং ছয়টি বেদাঙ্গর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। সুতরাং অপরাবিদ্যা বলতে বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং তার আনুষঙ্গিক বিদ্যাকে বোঝায়। অনুরূপভাবে পরা বিদ্যার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে পরা বিদ্যা হল সেই বিদ্যা যার দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়। অক্ষর অর্থ হল ক্ষয় নাই, স্থানে কালের অতীত। অর্থাৎ তা ব্রহ্মর সমার্থকবোধক। সুতরাং যা বেদের কর্মকাণ্ড হতে সরে এসে উপনিষদ্‌ বা বেদান্ত আশ্রিত আলোচনায় নিযুক্ত তাই পরা বিদ্যা।

এই উপনিষদের বৈদিকযুগে অভাবনীয় প্রতিপত্তি এবং উপনিষদের কাহিনী আছে যে রাজর্ষি জনক বিদ্যা লাভের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। উপনিষদ্‌ মৌলিক বচনগুলি সত্য বলে গৃহীত হত। তাই দেখি এই যুগে তাদের একটি বিশেষ পদ দেওয়া হয়েছে এবং আপ্তবচন হিসেবে বিভিন্ন দর্শনিক তত্ত্বের সমর্থনে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে মনে হয় উপনিষদের আলোচনা শিথিল হয়ে পড়েছিল সম্ভবত তার একটি কারণ ছিল। বাদরায়ন উপনিষদের দার্শনিক ..... করার জন্য রচনা করেন। সুতরাং যারা বেদান্ত পাঠে আগ্রহী তারা এই পাঠে মনোনিবেশ করতেন। তবে উপনিষদ্‌গুলি তখনও পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনে হয় পুরাণের যুগেও তাদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তা না হলে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানুষ হয়ে ও শংকরাচার্য কেন প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির উপর ভাষ্য লিখবেন? তারপরে শংকরাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতাবাদের প্রতিপত্তির ফলে তার পৃথক আলোচনা। আগ্রহী মানুষ বিশেষ ছিল না। মধ্যযুগে ভক্তিবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বি তাই দার্শনিকদের একমাত্র আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশে নতুন করে উপনিষদ্ চর্চার প্রবর্তন করেন রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সঙ্গে পরিচয় ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ শিথিল হয়। এই অবস্থায় রামমোহন বিগ্রহ বজায় উপসনা রীতির সন্ধানে ব্রহ্মসূত্রেও উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করেই নিরাকার উপসনা রীতির সমর্থন করেন এবং বেদান্ত গ্রন্থ রচনা এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙালি কে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য তিনি বাণীর সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য তিনি পাঁচটি ছোটো উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং গোড়াপতন করেন। তাঁর সাধনা-জীবনের আরম্ভই হয়, ঈশ উপনিষদের প্রথমপংক্তি নিয়ে তিনি উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অবশ্য বিভিন্ন উপনিষদ্‌গুলির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে তাদের প্রতি তার খানিকটা শিথিল হয়ে যায়। তার কারণ ছিল দুটি প্রথম এমন উপনিষদ্ আছে যা পৌরাণিক দেবতার মহিমা বর্ণনা করে। প্রাচীন উপনিষদের এমন বচন আছে যা জড় এবং জীবকে অঙ্গরূপে কল্পনা করে। এগুলি তার চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করত না কারণ তিনি ব্যক্তি রূপী সৃষ্টি পৃথক নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধা তিনি হারাননি। তিনি যে উপনিষদ্ কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা বোঝা যাবে তার আচরণ হতে তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ যে ধর্ম গ্রন্থ রচনা করেন উপনিষদ্ হতে নির্বাচন বচন তার মূল উপাদান। তার প্রথম খন্ডর নামও দেন ব্রাহ্মী উপনিষদ্। পৈত্রিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। তাঁর সাধনজীবনের উপনিষদের নিকেতন ভাষণমালায় ও তার প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে। আর এক সূত্র বাংলা ভাষার উপনিষদের পথ সুগম হয়েছিল। তার প্রেরণা ছিল স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে বেদান্ত প্রচার আত্মনিয়োগ। অদ্বৈত বেদান্তর সঙ্গে উপনিষদ্ বানীর নিবিড় সংযোগ আছে। সেই সূত্র রামকৃষ্ণ মিশনে হতে প্রাচীন উপনিষদ্ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে। ফলে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ মানুষেরও উপনিষদের চর্চার সুযোগ মিলছে। এইভাবে উপনিষদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশে একটি রীতি প্রচলিত ছিল যে বিবেকানন্দর সঙ্গে উপনিষদ্-এর নিবিড় সংযোগ আছে। সেই সূত্র রামকৃষ্ণ মিশনে হতে প্রাচীন উপনিষদ্ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে। ফলে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ মানুষের ও উপনিষদ্ সুযোগ মিলছে। এইভাবে উপনিষদ্ প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের দেশে একটি রীতি প্রচলিত ছিল যে কোন শ্রেণীর গ্রন্থ অত্যাধিক প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি বিশেষে নিজের অবশিষ্ট নিজের বিশিষ্ট মতকে সহজে প্রচার করতে আর ও এক উপায় ছিল বিশেষ গ্রন্থকে নিজের প্রচারিত অনুকূল ব্যাখ্যা করে এই উদ্দেশ্য সাধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুন্দর উদাহরণ মেলে ব্রহ্মসূত্র ও গীতার সম্পর্কে। উভয় গ্রন্থেরই মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশেষ দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাখ্যা করা যায়। ব্রহ্ম সূত্রের যেমন অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা আছে, তেমন বৈষ্ণব মতের অনুমোদিত ব্যাখ্যাও আছে। গীতার ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য আরো বেশি। উপনিষদ্ ক্ষেত্রে প্রথম রীতিটি অবলম্বিত হয়েছিল। ফলে দেখা যায় যেমন প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নিবেদিত উপনিষদ্ আছে, তেমন যোগদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত সন্ন্যাসবাদ উপনিষদ্ নামে প্রচারিত হয়েছে। আবার ভক্তি তত্ত্ব মূলক নানা উপনিষদ্ আছে। সন্ন্যাসবাদের প্রচারক হিসাবে নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরাণিক ভক্তিবাদের সমর্থক হিসেবে মহানারায়ণ উপনিষদের কথা বলা যেতে পারে। সেখানে ভক্তি মার্গকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই সব দেখেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ নামে প্রচারিত গ্রন্থগুলি পাঠ করে বলেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৭

২) দাস দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো

৩) শাস্ত্রী, গৌরীনাথ : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬২

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

পায়েল বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

"শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা" একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে বিবেচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা" নামে পরিচিত। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুগধর্ম পালনের জন্য অর্জুনকে যুদ্ধে পুনঃপ্রবৃত্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ অমৃত বর্ষণ করেছিলেন তাই "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা"। ভারতীয় জীবনে এমন কোন বিষয় নেই যেখানে গীতার আলোক বিচ্ছুরিত হয়নি। কর্ম বা ভক্তিকে ও জ্ঞানকে অবলম্বন করে অহংকার, আসক্তি ও ফলাকাঙ্খাকে বর্জন করে পরমাত্মা সাধনাই গীতার লক্ষ্য। গীতা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের অত্যুজ্জ্বল ও সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা স্বরূপ। আর এইজন্য কথিত আছে—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃশাস্ত্রবিস্তরৈ"

অর্থাৎ, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের কি প্রয়োজন? একমাত্র গীতা অধ্যয়ন ও অনুশীলনই যথেষ্ট। "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা" মোট অষ্টাদশ অধ্যায় বিভক্ত। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলো একাদশ অধ্যায়ের "বিশ্বরূপ দর্শন যোগ"। এই "বিশ্বরূপ দর্শন যোগে" অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপ সমূহ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নানান আকৃতি বিশিষ্ট দিব্য রূপ অর্জুনকে দর্শন করান। এই বর্ণনা "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার" একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। অর্জুন বলেছেন—

"মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম"।।

অর্থাৎ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি যে আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম গুহ্য উপদেশ আমাকে দিয়েছো, তার দ্বারা আমার এই মোহ দূর হয়েছে। হে পদ্মপলাশলোচন! সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয়। এবং তোমার কাছে থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য অবগত হলাম। হে পরমেশ্বর! তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলেছ যদিও আমার সম্মুখে তোমাকে সেই রূপে দেখতে পাচ্ছি, তবুও হে পুরুষোত্তম! তুমি যেভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ আমি তোমায় সেই ঐশ্বর্যময় রূপে দেখতে ইচ্ছা করি। তুমি যদি মনে করো আমি তোমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করার যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই দিব্য রূপ দেখাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ''।।

অর্থাৎ, হে পার্থ! নানাবর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপ সমূহ দর্শন করো। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশমরুৎ এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখো। হে অর্জুন! আমার এই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য কিছু দেখতে ইচ্ছা করো তা এক্ষণে দর্শন করো। কিন্তু তুমি তোমার বর্তমান চক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। তুমি আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন করো। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার বিশ্বরূপ দর্শন করান অর্জুন সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র ও অনেক অদ্ভূত দর্শনীয় বস্তু দেখলেন। সেইরূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল এবং তার শরীর দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। এই বিশ্বরূপ এমন শোভাযুক্ত ছিল যে যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয় তাহলে সেই মাহাত্ম্য বিশ্বরূপ প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে। তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখলেন। তারপর অর্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবান কে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন—

''পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মানমিশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্''।।

অর্থাৎ, হে দেব! তোমার দেহে দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা-শিব ঋষিদের ও দিব্য সর্পদের দেখেছি। হে বিশ্বরূপ! তোমার দেহে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং সর্বত্র অনন্ত রূপ দেখেছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

হে বিষ্ণু! তোমার আকাশস্পর্শী তেজোময় বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল আয়াত চক্ষুবিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। এবং আমি ধৈর্য-শম অবলম্বন করতে পারিছিনা। হে দেবেশ! ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখসকল দেখে আমার দিক্‌ভ্রম হচ্ছে। এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। উগ্র মূর্তি তুমি কে? কৃপা করে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি হচ্ছ আদিপুরুষ। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই। আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি। তখন শ্রীভগবান বলেন আমি লোকোক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ

কাল এবং এই সমস্ত লোক সংহার করতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা পাণ্ডবেরা ছাড়া উভয়পক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা নিহত হবে। অতএব, তুমি যুদ্ধ করার জন্য উত্থিত হও যশলাভ করো এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ করো। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধ বীরগণ আমার দ্বারাই নিয়োজিত হয়েছে। সুতরাং তুমি তাদের বধ করো। এবং বিচলিত হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয় জয় করবে, অতএব যুদ্ধ করো। শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলে হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার অন্তরঙ্গ শক্তি দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। তুমি ছাড়া এ জগতের কেউ আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ নয়। আমার এই প্রকার ভয়ংকর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যাথিত ও মোহাচ্ছন্ন হয়ো না। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করো। অর্জুন বলে হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। তখন শ্রী ভগবান বলেন তুমি আমার যেরূপ দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শনাকাঙ্ক্ষী। তুমি যে রূপ দর্শন করছ সেই প্রকার আমাকে বেদ অধ্যায়ন, তপস্যা দান ও পূজার দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ নয়। যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত তিনিই আমাকে লাভ করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি –

১। অভয়াচরণাদিবিন্দ স্বামী প্রভুপাদ : "শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ", শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী (অনুবাদিত) ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, শ্রীমায়াপুর।

২। "শ্রীমদ্ভগবদগীতা" বামাদেব ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩। "শ্রীমদ্ভগদগীতা" জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), প্রেসিডেন্সী, কলকাতা, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৪। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বামাদেব ভট্টাচার্য (প্রণীত ও সম্পাদিত), শ্রীগুরু পুস্তকালয়, কলকাতা।

কুললয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃতস্নমধর্মোৎভিভবত্যুত।।

মহাকবি ভাস

অহনা আচার্য্য
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

কথামুখ : প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে অন্যতম মহাকবি তথা নাট্যকার ভাস। তিনি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণ ভারতের পদ্মনাভ পুরমের নিকট মনলিক্করনাথম্ নামক স্থান থেকে ১৩টি পুঁথি আবিষ্কার করেন, যার রচয়িতা ভাস কিনা সেই সম্পর্কে কিছু মত বিরোধ আছে। যা সংস্কৃতে ভাস সমস্যা নামে পরিচিত।

ভাস নাটক চক্র : ভাস রামায়ণ, মহাভারত লোক কথার উপর ভিত্তি করে মোট ১৩টি নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকগুলি যথাক্রমে রামায়ণ মূলক, প্রতিমানাটকম্, অভিষেকনাটকম্।

মহাভারত : দূতবাক্যম্, দূতঘটোৎকচম্, মধ্যমব্যায়োগম্, পঞ্চরাত্রম্, উরুভঙ্গম্, কর্ণভারম্, বালচরিতম্।

লোক কথা মূলক : প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়নম্ স্বপ্নবাসবদত্তম্, অবিমারকম্, চারুদত্তম্।

ভাস নাটকচক্রের পরিচয় :

১। প্রতিমা : রামায়ণের মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক প্রতিমা। দশরথ কর্তৃক রামের রাজ্যাভিষেক উদ্যোগ, লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রামের বন গমন, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, রাম কর্তৃক সীতা উদ্ধার এবং রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত। মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় ভরত বিশ্রামের জন্য এক দেব মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে দশরথ ও অন্যান্য পূর্ব পুরুষের প্রতিমা দর্শন করেন। এবং পূজারীর মুখ থেকে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে বিহ্বল হন। এই ঘটনার পর ভরতের মনোভাবের যে পরিবর্তন এবং পরবর্তী ঘটনার ওপর তার প্রতিক্রিয়া সেই তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতেই নাটকের নামকরণ হয়েছে প্রতিমা।

২। অভিষেক : রামায়ণের কিষ্কিন্ধা থেকে লংকা কান্ড পর্যন্ত কাহিনী এই ষষ্ঠাঙ্ক নাটক রচিত। সীতা হরণের পর সুগ্রিবের সাথে রামের মৈত্রী, রাম কর্তৃক বালিকে বধ, সুগ্রীবের বন রাজ্য লাভ থেকে শুরু করে বিদ্যাধরদের সংলাপে রাম কর্তৃক রাবণের বধের সংবাদ পরিবেশন, সীতা উদ্ধার, সীতার প্রতি রামের বিরূপ আচরণ, সীতার অগ্নি শুদ্ধি, রামের অভিষেক পর্যন্ত কাহিনী নাটকায়িত।

৩। কর্ণভার : নাট্যপরিভাষায় এর নাম ব্যায়োগ। মহাভারত প্রসিদ্ধ কর্ণ চরিত্রের বদান্যতা বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গৌরব ও একাঙ্কিকার বিষয়বস্তু। বীর রসের সাথে দুঃখসংঘাত কারুণ্য বোধের মূল

কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। এবং মহাভারতের ভাগ্য বিড়ম্বিত কর্ণ চরিত্রের অনুদঘটিত মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪। উরুভঙ্গ : মহাভারতের যুদ্ধ পর্বের শেষ পর্যায়ের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। ভীম কর্তৃক অন্যায়ভাবে উরুভঙ্গ ও দুর্যোধনের পরাজয়, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পুত্রশোক, ভগ্নজানু, দুর্যোধনের উরুতে তার শিশু পুত্রের আহরণের প্রচেষ্টা মৃত্যু পথযাত্রী দুর্যোধনের সংলাপে বীরের মহত্ব এই নাটকের আদ্যন্ত বিষয়। কাহিনীর উপস্থাপনা ও নাট্যভঙ্গিতে উরুভঙ্গ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অভিনব সংযোজন।

৫. দূতবাক্য : মহাভারত প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক ব্যায়োগ। কুরুক্ষেত্রের পূর্বে পাণ্ডবদের দূতরূপে কৃষ্ণের শান্তি প্রস্তাব থেকে শুরু করে রাজসভায় আগত কৃষ্ণের সম্মুখে দুর্যোধন কর্তৃক দ্যূত ক্রীড়ার চিত্র উন্মোচন, দুর্যোধন ও কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুত্তরের পারস্পরিক নিন্দা প্রভৃতি কাহিনীর উদ্ভাবনে মৌলিকতার পরিচয় থাকলেও নাট্যগতি খুবই শ্লথ এবং কোনও কোনও চরিত্রের মুখে দীর্ঘ সংলাপ নাট্যরসের পরিপন্থী।

৬. দূত-ঘটোৎকচ : মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তু হলো পাণ্ডব পক্ষের বীর অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে ছয় কৌরবরথীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। এই সময় পাণ্ডবদের পক্ষের থেকে কৃষ্ণের দূত রূপে ঘটোৎকচ কৌরবদের সভায় এসে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে কৌরব পক্ষের বীরগণের ভাবী অমঙ্গলের কথা জানালেন। দূতরূপে বিষয় এবং তদানুসারে নাটকের নামকরণ সম্পাদিত হয়েছে।

"ধর্মং সমাচার, কুরু স্বজন বপেক্ষাং।
যৎ কাঙ্খিতং মনসি সর্বমিহানুতিষ্ঠ।।
জাত্যোপদেশ ইব পাণ্ডব রূপধারী।
সূর্যাংশুভিঃ সমুপৈষ্যতিবঃ কৃতান্নঃ।। "

৭. পঞ্চরাত্র : মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিন অংকের নাটক পঞ্চরাত্র। পরিভাষায় এর নাম সমবকার। দুর্যোধন কর্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির সন্তোষ, দ্রোণ কর্তৃক দক্ষিণা রূপে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য চাওয়ার ইচ্ছা, ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কৌরব বাহিনী কর্তৃক বিরাট রাজার গোধন হরণের জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধে কৌরবদের পরাজয়, পাণ্ডবগণকে অর্ধ রাজ্য প্রদান নাটকের মূল কাহিনী।

৮. বালচরিত : বালক কৃষ্ণের চরিত এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিষয় বস্তু প্রস্তাবনায় সূত্রধরের মুখে চার যুগে অবতারের স্তুতি, নারদের সংলাপে জানা গেল ভগবান বিষ্ণুই কলি যুগে কংসকে নিধনের জন্য দেবকীর পুত্র রূপে জাত। তার মূল নাটক শুরু দেবকী বাসুদেবের সাহায্যে নবজাত পুত্রকে নন্দ

গোপের গৃহে স্থানান্তরিত করেন। নন্দ গোপ শিশু কৃষ্ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেলেন। অন্যদিকে মহারাজ কংস নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে লাগলেন। চণ্ডাল কন্যারা তাঁর সম্মুখে হাজির হয়ে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কংস শান্তিতে নিদ্রার চেষ্টা করলেও দৈবদুর্বিপাকে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে বালক কৃষ্ণের অদ্ভূত বীরত্ব কাহিনী গোপ্রধানদের সংলাপের অন্যতম বিষয়। কালিয়া দমন, চানুক ও মুষ্টিকের সঙ্গে সংঘর্ষ, গোদামোদর এর মল্ল যুদ্ধ এবং তাঁদের দ্বারা কংস নিধন ও গোপ সমাজের মঙ্গল বিধানের দ্বারা কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

৯. মধ্যমব্যায়োগম্ : নামকরণ থেকেই বোঝা গেল এটি ব্যায়োগ শ্রেণীর নাট্য রচনা। মধ্যম অর্থাৎ মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই নাটকের মুখ্য চরিত্র, অন্য দিকে মধ্যম বা দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ কুমারের প্রাণরক্ষা এর অন্যতম ঘটনা। কাহিনী অনুসারে এই ব্রাহ্মণ দম্পতি তিন পুত্র সহ হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের হাতে পড়ে; ঘটোৎকচ তার মাতার খাদ্য রূপে ব্রাহ্মণ দম্পতির এক পুত্রকে দাবি করলেন। নিরুপায় ব্রাহ্মণ সন্তানকে রক্ষা করার জন্য কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করলেন; ভীম ঘটোৎকচের কার্যে বাধা দিলেন, তখন সকলে হিড়িম্বার সামনে হাজির হলেন, ঘটোৎকচ মাতার নিকট ভীমের যথার্থ পরিচয় জেনে লজ্জিত হলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ পুত্র মুক্তি পেলেন এবং পিতা পুত্রের মিলন ঘটল।

১০. প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ : প্রাচীন ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় উদয়ন কথা অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ রচিত। এই নাটকের কাহিনী এইরূপ যে বৎস রাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বির রাজ প্রাসাদে রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন বিন্ধ অরণ্যের নাগ বনে উদয়নের হাতি শিকার সম্পর্কে আলোচনা, মহাসেন কর্তৃক কৃত্রিম হাতির ছলনায় উদয়নকে বন্দি করা, বন্দি উদয়ন কে উদ্ধার করার জন্য যৌগন্ধরায়ণ এর প্রতিজ্ঞা, ব্রাহ্মণ দৈপায়ন কর্তৃক উন্মাদের ছদ্মবেশে কৌশম্বির ভজনসভায় উপস্থিতি এবং ছদ্মবেশ ত্যাগ করে পলায়ন থেকে শুরু করে মহাসেন কর্তৃক উদয়নকে জামাতা রূপে স্বীকার এবং কৌশম্বির প্রাসাদে বধূর ছবি সাজিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন নাটকটির মূল অংশ।

১১. স্বপ্নবাসবদত্তম্ : উদয়ন ও বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছয় অংকের নাটক। পদ্মাবতীর সাথে বিবাহ হলে উদয়ন এর ভাগ্যোদয় হবে এই জেনে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিকাণ্ডের মিথ্যা ছলে নিজের এবং বাসবদত্তার মৃত্যু রটনা করে দেন। তারপর বাসবদত্তাকে অবন্তিকা নামে পার্বতীর কাছে ন্যাস রাখলেন। এরপর ঘটনাক্রমে পদ্মাবতী ও উদয়নের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তা কে ভুলতে না পেরেও পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। ঘটনাক্রমে উদয়নের সজ্জায় বসে ঘুমন্ত উদয়নের মুখ থেকে তার প্রতি সকল অনুরাগের কথা জানতে পারে। হঠাৎ মহাসেনের থেকে বাসবদত্তার ধাত্রী রাজার সভায় উপস্থিত হয় এবং ধাত্রী মারফৎ মহাসেন কন্যার যে

ছবি পাঠিয়েছেন পদ্মাবতী বুঝেছেন যে অম্বিকাই বাসবদত্তা। এরপর স্বপ্নের মাধ্যমে বাসবদত্তার সান্নিধ্য লাভ এবং নায়ক নায়িকার পুনর্মিলন নাটকের মূল বক্তব্য।

১২. অবিমারক : অবিমারক নাটকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ও জনৈকা রাজকন্যার প্রণয় বর্ণিত। সৌবীর রাজের পুত্র বিষ্ণু সেন একদা কুন্তিভোগের কন্যা কুরঙ্গীকে মত্ত হাতির কবল থেকে রক্ষা করেন। তারপর নানা অনুরক্ত হন। কিন্তু চন্ডালের সাথে রাজকন্যার বিবাহ সম্ভব নয়। অন্যদিকে নায়িকা ছদ্মবেশ ধারণ করে নায়কের অন্তপুরে প্রবেশ করেন অতঃপর গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনীটি প্রকাশ হলে নায়ক নায়িকা পলায়ন করেন। এবং তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করলে এক অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পান। তারপর তিনি বিদ্যাধর প্রদত্ত আংটির দ্বারা রাজা বিষ্ণু সেনে পরিণত হন এবং নায়ক নায়িকার মিলন ঘটে।

১৩। চারুদত্ত : এই নাটকটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই নাটকটি আবিষ্কারের পর চারুদত্ত ও মৃচ্ছকটিকের মধ্যে কোনটি প্রাচীন, উভয় নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। বলা বাহুল্য চারুদত্তের লুপ্ত অংশটির উদ্ধার না হলে এতাদৃশ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ভাস নাটকের প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার : নাট্যকার ছিলেন প্রথিতযশা ব্যক্তি। তিনি যথেষ্ট বাস্তববাদী ব্যক্তি ছিলেন। যার প্রভাব তার নাটকে পাওয়া যায়। তার নাটকে যে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন সেগুলো বাস্তববাদী। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ প্রতিম প্রবচন যথাঃ (১) চক্রারপঙ্‌ক্তিরিবঃ গচ্ছতি ভাগ্য পঙ্‌ক্তিঃ। (২) কর্তারঃ সুলভা লোকেবিজ্ঞতারস্তু দুর্লভাঃ। (৩) স্মৃত্বা স্মৃত্বা যাতি দুঃখং নবত্বম্।

(৪) জাগ্রতোঽপি বলবত্তরঃ কৃতান্তঃ।

(৫) মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতাঞ্চদৈবতম্।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. গোপ যুধিষ্ঠির, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ ১৮ই জুলাই ১৪০৭, লক্ষ্মী কম্পিউটার সেন্টার ৮-ডি, বেচুলাল রোড, কলকাতা ৭০০০৪৬।

২. দাস দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ ১৪০৪, অভিনব মুদ্রানী, কোলকাতা।

৩. স্বপনবাসবদত্তম্, অনিল চন্দ্র বসু, প্রথম সংস্করণ-২০০৪, নিউ জয়কালি প্রেস, কলকাতা ৬।

৪. শাস্ত্রী নমিচন্দ্র, মহাকবি ভাস, হিন্দি আকাদেমি, মধ্যপ্রদেশ, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮০।

আদর্শ নারীত্বভাবনায় ভবভূতি

আল্পনা পাল
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

কালিদাসোত্তর যুগে নাট্য সাহিত্য চর্চায় যে সমস্ত নাট্যকারের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভবভূতি। নাট্য সাহিত্যে ভবভূতির গৌরবোজ্জ্বল অবদান কালিদাসের ন্যায় তাঁকেও সম্মানে অতি উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কালিদাস যেমন রসসিদ্ধ কবি, তেমনি এই নাট্য কারের সঙ্গে যদি কেউ তুলনীয় হন তাহলে ভবভূতির নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। নাট্য সাহিত্য জগৎ কে তিনি তিনটি নাটকের উপহার দিয়েছেন, যথা- মালতী মাধব , মহাবীর চরিত, উত্তর রামচরিত। তিনি নাটক গুলির বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে সামাজিক প্রাকৃতিক প্রভৃতি বর্ণনা উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর আদর্শ কে তিনি বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। কারণ সমাজে বিভিন্ন কর্ম সিদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই নারীও সমভাবে প্রযোজ্য। তাই তিনি তাঁর প্রতিটি নাটকে বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে নারীকে মহনীয় পদে অলঙ্কৃত করেছেন এক নারীর আদর্শ কে গৌরবান্বিত করেছেন।

নারীকে কন্যা , পত্নী আর মাতা- এই তিন রূপের দ্বারা চিত্রিত করেছেন। ভবভূতি এই রচনার মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিতে কন্যার অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে কন্যা হলো পরার্থ বস্তু বা সামগ্রী , যাকে কারোর না কারো হাতে অর্পণ করতে হয়।

"কন্যাশ্চ পরাথতৈব মতা পরার্থা এব"

(মহাবীরচরিত ১/৩০)

কন্যা সকলের যাচঞা পাত্র হয়ে থাকে। এর সমর্থনে মহাবীরচরিতে বলা হয়েছে -

"সাধারন্যানিরাতঙ্ককন্যামন্যোইকি যাচতে
কিংপুনর্জগতাং জেতা প্রপৌত্র পরমেষ্ঠিনঃ"।

(মহাবীরচরিত ১/৩)

কন্যাদানের দ্বারা বিত্তশালী ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়, যা স্নেহসূত্রে সংস্থাপক হয়। কন্যা দানে একমাত্র পিতাই অধিকারী হন। ভবভূতির রচনায় উপস্থিত কন্যা অত্যন্ত সুশীল। এরা সমস্ত দুঃখ কে সহ্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এরা মাতা পিতা র দুঃখ সহনে অক্ষম। (মালতিমাধব / অঙ্ক /২)

স্ত্রী কৌমার্যকালে কোনো নারী পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপনকে তৎকালে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ভবভূতি নারীর প্রতি কতটা সম্মান ছিল তা নিম্নে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাক্যটির দ্বারা অনুমেয় – " গুণা পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।। " (উত্তর.৪/১১) নারীকে পত্নী রূপে ভবভূতি মনোরম প্রদর্শন করেছেন। সে গৃহের লক্ষী , পতির আনন্দদায়িনী।

স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এবং একে অপরের ভাব বিনিময়কারী। দাম্পত্য সম্বন্ধে উচ্চ চিন্তা ভবভূতির রচনা ছাড়া অন্যত্র পাওয়া দুর্লভ। স্ত্রী সহধর্মিণী হওয়ার সাথে সাথে দৈনন্দিন কার্যে পরামর্শ দাত্রীও হন। কঠিন এবং উচিৎ ও অনুচিৎ কার্যে যে স্বামীকে সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকে।

নারী পতিকে কখনো ধর্মচ্যুত হতে দেখতে চায়নি। স্ত্রী সুখ, দুঃখ, ভোগ , বিলাস, সম্পত্তি বিপত্তিতে পুরুষের সাথ দেয়, এবং তার ধার্মিক কার্যতে সর্বাধিক, উপযোগিনী হয়। এর সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে - " অর্ধো হ বা এষ আত্মোন যজ্জায়া"(৫/২/১০)। অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের অর্ধাঙ্গ। যতদিন পর্যন্ত পুরুষ স্ত্রীকে লাভ না করে ততদিন সে অসম্পূর্ণ থাকে। ঐতেরেয় আরণ্যকেও এর পুনরুক্তি ঘটেছে। আমরা ভবভুতির উত্তর রামচরিতে (১/৩৬) সীতাকে স্বামী শ্রী রামচন্দ্রের সহ ধর্ম চারিনী- বা অনুবর্তিনি রূপে পেয়ে থাকি।

কবি রচনায় উপস্থিত নারী শিক্ষিতা সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণা, কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞা এবং সুসংস্কৃত যুক্তা। কামন্দকী সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তিনি রাজ্য থেকে বাইরে অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন। মালতী চিত্রকলাতে পটু ছিলেন। মনোবিনোদন এবং বিরহবেদনা পরিশ্রান্তির জন্য মাধবের চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। কামন্দকী একদিকে নীতির নানা উপদেশ দিতেন এবং অপরদিকে তিনি ধর্মশাস্ত্রের ও নির্দেশ দিতেন। ভবভূতির রচনায় আশয় হল এই যে স্ত্রীরা অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যেতে পারতেন। এক কথায় বলা যায় যে নারীগণ সে সময়ে শিক্ষার সুযোগ পেতেন। অভি রচনাতে নারী স্বঅভিমানী রূপে চিত্রিত হয়েছে, সীতার কথিত বাক্যতে দেখতে পাই -

"নয়তু মামাত্মনোইঙ্গেষু ন সহিষ্যামীদৃশং জীবলোকস্য পরিভবমনুভবিতুম"।

(উত্ত. ৭/১৩-১৭)

ভবভূতির নারী চরিত্রের মধ্যে কুটিল নারী চরিত্র দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে শূর্পনখা ও কপালকুণ্ডলার নাম নেওয়া যেতে পারে। কিন্তুএটা ভবভূতির আদর্শ নয় , পাত্রদের বহুবিধ প্রকার প্রদর্শন করতে গেলে বিপরীত প্রকৃতির পাত্রও চোখে পড়বে।

ভবভূতির রচনা সীতাকে সতীর্থ স্থাপনের জন্য অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জগতের নিয়ম বিচিত্র ধরনের। তাই যদি কেউ সীতাকে নিন্দা করে তাহলে তার উক্তি পাপময়। সীতার দ্বারা জগৎ সুনাম এবং পূর্ণাত্মা প্রাপ্ত হয়েছিল।

রচনায় নারী সন্তানের প্রতি করুণাময়ী। ভগবতী পৃথিবী সীতার কল্যাণের জন্য সর্বদা চিন্তিত ছিলেন। সন্তানই তো স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয় গ্রন্থিতে আরো দৃঢ়তার সাথে জুড়ে দেয়। পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্মের প্রতিও নারী অপত্য সম্বন্ধে স্থাপন করে নেয়।

সে বলতে পারি যে, ভবভূতির পূর্বযুগীয় কবিদের লেখনীতে যেভাবে নারী চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার থেকেও অতি উন্নত ধরনের চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভবভূতির নাটকগুলির মধ্যে। যুগের পর্যায়ক্রমিক প্রবাহে সমাজের উন্নতির সাথে সাথে সমগ্র নারী জাতি উচ্চাসনে সমকীর্ণ হয়েছে। বর্তমান দিনে দেখা যায় যে নারী, চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে উন্নতির শিখরে আসীন হয়েছে। নারী আজ তার আপনভাগ্য জয় করবার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। জীবন বিকাশের বিচিত্র ধারায় আজ তার প্রতিভার নানা স্বাক্ষর। আজ পর্বতশীর্ষে রেখে আসে দুঃসাহসিকতার পরিচয়। আকাশ পথে সে পাড়ি দেয়। মরু অভিযানে সে হয় পুরুষের সহযাত্রীনি জ্ঞান-বিজ্ঞান -শিল্প-সাহিত্যে বিজয়িনীর দীপ্ত মহিমা। আজ এক নতুন পৃথিবী, নতুন জীবনের জন্য অপেক্ষা করে আছে, যেখানে থাকবেনা নারী ও পুরুষের কোন ভেদাভেদ।

গ্রন্থপঞ্জী

১) মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু; সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪১৯ (১ লা বৈশাখ ১৪২৬ দ্বিতীয় পরিমার্জিত প্রকাশ)।

২) সীতানাথ, দাস দেব কুমার; উত্তররামচরিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৩) বন্দোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ; সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮ (দ্বিতীয় সংস্করণের অষ্টম মুদ্রণ :- আগষ্ট ২০১৮)

দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে মানবিক মূল্যবোধ

প্রিয়া বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

দর্শন কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ দৃশ্+অনট্= দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্, যার সাধারণ অর্থ দেখা। এই দেখা নানারকম হতে পারে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ, ধারণালব্ধ জ্ঞান বা কোন অভিজ্ঞতাও দেখা শব্দের অর্থ হতে পারে। আবার দেখা মানে ঘটনার পর্যবেক্ষণ আত্মার পরিজ্ঞান (insight the soul) ও হতে পারে। কিন্তু দর্শন বলতে উপলব্ধ সত্যকে বিচারমূলক অন্তর্নিরীক্ষণ বা সত্যের সাক্ষাৎকার। কিন্তু সাধারণ দেখা আর দর্শন এক নয়। দর্শন শব্দের অর্থ দৃষ্টি। যে শাস্ত্রের অধ্যয়নে যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টিগোচর হয়, তাই দর্শনশাস্ত্র। অতএব তত্ত্বদর্শনের উপায় শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র।

ইংরেজি শব্দ 'Philosophy' মানে জ্ঞানের জন্য অনুরাগ। সুতরাং Philosophy ও দর্শন সমার্থক নয়। তবুও আলোচনার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি লক্ষ্য করে Philosophy ও দর্শন প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

আত্মাকে জানায় ভারতীয় দর্শনের মূলকথা, তাই ভারতীয় দর্শন অন্তরের গভীরতম প্রদেশের অন্তদৃষ্টিতে বহির্জগৎ কে বোঝার চেষ্টা করেছে। দর্শন হলো এক পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণ, যা আত্মার চৈতন্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং, সত্যের স্বরূপ উপলব্ধিই দর্শন। যদিও পাশ্চাত্য দর্শনও সত্যের অনুসন্ধান করে তথাপি পাশ্চাত্য দর্শন মুখ্যতঃ আলোচনা শাস্ত্র, জীবনতন্দ্র নয়। ভারতীয় দর্শন মুখ্যত একধারে আলোচনা শাস্ত্র ও জীবন দর্শন দুই-ই।

দর্শনচিন্তা কোন দেশের ধ্যানধারণা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ভারতবর্ষের দার্শনিক সম্প্রদায় সমূহের বৈচিত্র্য একধারে ও পার্থক্যের মধ্যেও এক মৌলিক সংস্কৃতিগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। একে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার ঐক্য বলা যেতে পারে। যেমন-

১) ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল ব্যবহারিক প্রয়োজনের চাহিদা থেকে। কেননা দর্শন চর্চার মূল লক্ষ্য সর্বোৎকৃষ্ট জীবনযাপন ও পরম পুরুষার্থ লাভ। তাই দার্শনিক চিন্তা বাহ্য ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে অন্তর্দৃষ্টিতে এক প্রজ্ঞাময় জীবন যাপনে উৎসাহী ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক ও চিন্তামূলক।

২) ধর্ম ও দর্শন এক নয়। সাধারণত আমরা দর্শনকে ধর্ম বলে ভুল করি। মানবাত্মার ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা ধর্ম নয়। ধর্ম আবার নিছক কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্মস্বরূপতঃ

কোনো আদর্শের অনুসন্ধান। তাই প্রাচীন ঋষিরা কেবল সত্যানুসন্ধানী ছিলেন না, সত্যকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য মানুষের মধ্যে যুক্তি প্রয়োগ ও গোষ্ঠী ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনার স্বাধীনতা ছিল। ফলস্বরূপ নাস্তিক, বুদ্ধিবাদী স্বাধীন চিন্তাবিদ, জড়বাদী সংশয়বাদী ইত্যাদি বিভিন্ন মত প্রলম্বিত হয়েছিল। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বিধান করা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩) ভারতীয় দর্শন জীবনবিমুখ নয়। 'জীবনের জন্য জ্ঞান' 'জ্ঞানের জন্য জীবন নয়। ' জৈন দর্শনের এই নীতি সকল ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই ভারতীয় দর্শন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। জগতের চরম কারণ কি? ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা? দেহাতিরিক্ত আত্মা কি আছে, আত্মা নিত্য না অনিত্য-- এসকল তাত্ত্বিক আলোচনার সাথে অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যাও ভারতীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয়।

৪) 'মুক্তি' ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে দুঃখ দূর করার উপায় ভারতীয় দর্শনকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তাত্ত্বিক আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাঙ্গ যোগাদির প্রয়োগ করে মুক্তিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতীয় দর্শন সুখ দুঃখ দিয়ে শুরু হলেও দুঃখ জীবনের শেষ পরিণতি নয়। দুঃখ নিরোধই শেষ কথা। অতএব ভারতীয় দর্শন সুখবাদী।

৫) ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদের ভিত্তি হলো কর্মবাদ। জীব যেমন কর্ম করবে তাকে তেমনি ফল ভোগ করতে হবে। এই কর্মবাদের ওপরই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। এ জীবনে না হলেও শুভাশুভ ইত্যাদি জীবনের সকল নৈতিক মূল্যই কর্মফল এর উপর সংরক্ষিত। নিষ্কাম কর্মে ফলভোগ নেই, সকাম কর্ম জন্মান্তর গ্রহণ হয়।

৬) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদের সর্বকালব্যাপী এক নৈতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলায় (An meternal order) বিশ্বাসী। ঋক্‌বেদে চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য জাগতিক শৃঙ্খলাকে 'ঋত' বলা হয়েছে। ইদানিংকালের বৈজ্ঞানিকেরাও এই 'ঋত' কে বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। 'ঋত' এর রহস্য উদঘাটিত হলে জগৎ আর রহস্যাবৃত থাকবে না। 'ঋত'ই মীমাংসকদের 'অপূর্ব' ও নৈয়ায়িকদের 'অদৃষ্ট' নামে অভিহিত।

৭) সব ভারতীয় দর্শনই অবিদ্যা অজ্ঞান কে জীবনের বন্ধনের ও দুঃখের কারণ বলেছে। আত্মা নিত্য হলেও কর্মফল ভোগের জন্য আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয় অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। সম্যক্ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাম হলে

জীব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মোক্ষ লাভের জন্য সংযম ও নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন। মোক্ষই একমাত্র পুরুষার্থ। তাই ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্মোপলব্ধি 'আত্মানাং বিদ্ধি।

অতএব, তত্ত্ব দর্শনের উপায় শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র। ভারতীয় দর্শনের তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান এবং মোক্ষজ্ঞান সবকিছুই সুনিশ্চিত হয়। দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে, মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দর্শনের সমস্ত অভিজ্ঞতায় প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

অধ্যাপক ভট্টাচার্য অমিত, ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, সংস্করণ: ২০০৩ (২০০৯)

শর্মা পূর্ণচন্দ্র পাতঞ্জল দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, সংস্করণ: ১৯৮৩ (২০০৫)

অধ্যাপক, ডঃ মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, সংস্করণ: ১৪১৯ (১লা বৈশাখ, ১৪২৬)

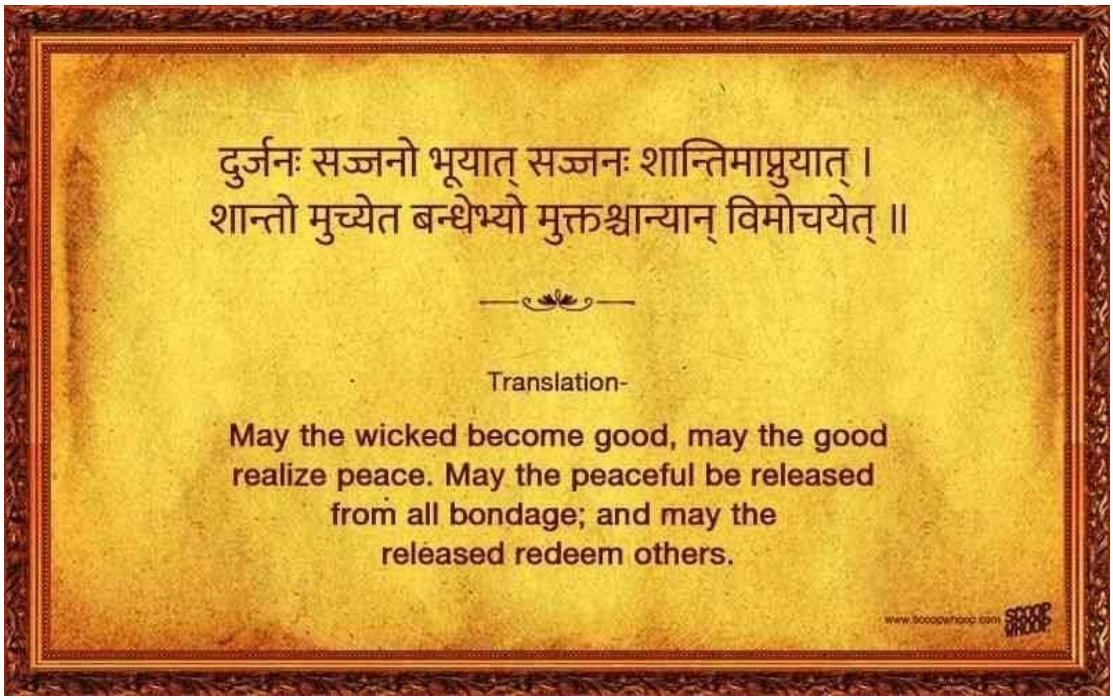

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পরিবেশ সচেতন

অঙ্কিতা বৈরাগী
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

কৌটিল্য হলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য। চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। বিভিন্ন সমালোচকগণের মতে, কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটির সময়সীমা আনুমানিক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক। এই গ্রন্থটি প্রধানতঃ গদ্যের রচিত এবং ভাষায় প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রের 'অর্থ' শব্দটির দ্বারা কৌটিল্য কেবল মাত্র সম্পদকে গ্রহণ করেননি, সম্পদের প্রয়োজনকারী মনুষ্যগণের যে পৃথিবী বা ভূমি তাকেই তিনি অর্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। ঐ পৃথিবীর রক্ষণ বা পালন বিষয়ক যে শাস্ত্র, কৌটিল্য তাকে 'অর্থশাস্ত্র' বলেছেন।

> "মনুষ্যানাং বৃন্তিরথ: মনুষ্যবতী ভুমিরিত্যর্থ:, তস্যা পৃথিব্যা লাভ পালনে
> পায: শাস্ত্রমর্থ শাস্ত্রমিতি"

সমস্ত শাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কৌটিল্য এই গ্রন্থটির রচনা করেন। ঐ গ্রন্থটি প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করে। একটি রাষ্ট্রকে কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা যায় কিভাবে রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, একজন রাজা কিভাবে রাষ্ট্র পরিপালন করেন সেই সমস্ত বিষয়গুলি অর্থশাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠকসমাজ এই গ্রন্থটিকে একটি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ এবং কৌটিল্যকে একজন জটিল বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ বলে মনে করেন। তার লেখনীর স্পষ্টতা রাজনীতি বিষয়ক মনোভাব গ্রন্থের বিষয় সম্পাদনার স্বাতন্ত্র্যতা সত্যই স্বীকার্য। তথাপি মহামতি কৌটিল্য এই গ্রন্থে রাজনীতি দণ্ডনীতি ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় করেছেন। হয়তো পাঠকগণ এই বিষয়টির ওপর ততটা গুরুত্ব দেয় না। বিষয়টি হলো কৌটিল্যের প্রকৃতি সচেতনতা বর্তমান যুগে পরিবেশ নিয়ে যে বিশাল সমস্যা তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পরিবেশ সচেতনতা বিষয়টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসনে বসানো যেতেই পারে।

বর্তমান যুগে সমগ্র প্রাণিজগতের কাছে সবথেকে বড় সমস্যা হল পরিবেশ তথা প্রকৃতির নিয়মিত পরিবর্তন। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বিশ্বময় যে পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি হয়েছে যার

ফলে শারীরিক-মানসিক নানাবিধি অস্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্দশা সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত করেছে। তাই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে।

সুপ্রাচীন কালেও বিশ্বজগতকে দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত এবং প্রকৃতিজাত সম্পদকে সুরক্ষিত করে সমগ্র রাষ্ট্রপতি একটি সুন্দর সুসংহত প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মাণের মাধ্যমে জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও কৌটিল্যের প্রয়াস বিশেষ লক্ষণীয়।

আরম্ভ করে কালিদাসের সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও, একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে- প্রকৃতি তথা পরিবেশ। ঠিক এমন ভাবে কৌটিল্য রাজনৈতিক কৌটিল্য ও তাঁর অর্থশাস্ত্রে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের অনুপূরক পরস্পরের সমন্বয় পূর্ণ সম্পর্কের দাঁড়াই গড়ে ওঠে একটি সুসংহত পরিবেশ। তাই কৌটিল্য অস্ত্রশস্ত্র প্রকৃতি সম্পর্কে যত্ন পূর্বক রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের গুরুত্ব দিয়েছেন। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো দক্ষতার সঙ্গে প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে-

"समाहर्ता र्दुा राष्ट खनिं सतुं बनं ब्रजं बणिकपथं चाबेक्षेत"।

মহামতি কৌটিল্য সেতু, বন, ব্রজ এই তিনটি শব্দকে অতিশয় ব্যাপকতার অর্থে প্রযুক্ত করে প্রকৃতি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এই তিনটি কে রাজকোষের প্রধান উৎস বলে গণ্য করা হত এবং রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। রাজাকে রাজকোষ বৃদ্ধির উপদেশ প্রসঙ্গে কৌটিল্য বারবার শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অরণ্য সৃজনের দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন। অর্থশাস্ত্রের য় অধিকরণে বলা হয়েছে, -

"सहीदक माहायेदिकं बा सेतु बन्धयेत अन्येषा बा बन्धंना भुमि मार्ग
बृक्षोपकरणानुग्रहं धुयति, पुण्यस्थानारामणांच"

কৃষি কাজের জন্য জলের প্রয়োজন তাই জলাশয় বা খাল নির্মাণের জন্য কৌটিল্য গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষিকাজের উপযোগী জলের বাঁধ ভেঙে ফেলা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। যে সকল জলধরা জলহীন বা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে সেগুলিকে যাতে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে কৌটিল্য নির্দেশ দিয়েছেন।

"अनुदकनुन्तम: साहसहन्ड: भागनित्सृष्टकं मध्यम:"

যারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কৃষি কাজ করবে রাজা তাদের জমি যাতায়াত পথ বিবিধ উপকরণ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করবেন। কৃষি কাজের সময়ে জলধারা থেকে যেসব মাছ, জলচর প্রাণী, পাওয়া যেত সেগুলি রাষ্ট্রের বলে গণ্য হতো এবং রাজা সেগুলি প্রজাদের কাছে বিক্রয় করতেন। ওই জমি কে প্রজাগণ কৃষি কার্যের প্রয়োজন না করলে রাজকোষের যে ক্ষতি হতো তা ওই প্রজাদের পূরণ করার নির্দেশ ও দেওয়া আছে অর্থশাস্ত্রে-

"अकृषताय अच्छद्य अन्येस्यत् प्रयच्छेत् प्रयच्छेत्। ग्रामभृतकबैदेहका बा
कृषेयु: अकृषन्तेइबहेतं् दद्यु:"।

কৌটিল্য নতুন নতুন বন সৃজনের উপদেশ দিয়েছেন। বৃক্ষচ্ছেদন এর জন্য বিবিধ দণ্ড বিধান করছেন কৃষিকাজের অনুপযুক্ত জমি গুলিকে কৌটিল্য যেভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয় যে, পরিবেশের সাম্য রক্ষার দিকে তার বিশেষ নজর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন বনাঞ্চলের উল্লেখ আছে। জলাধার ও জনবসতির চারপাশে ফল ও ফুলের গাছ লতা মন্ডপ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কৌটিল্য। নগর উদ্‌যাপনের ছায়াপ্রদানকারী গাছ কৌটিল্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেক বুক এজেন্সি, কলকাতা

বন্দ্যোপাধায় ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮ (দ্বিতীয় সংস্করনের, অষ্টম মুদ্রনঃ- আগস্ট, ২০১৮)

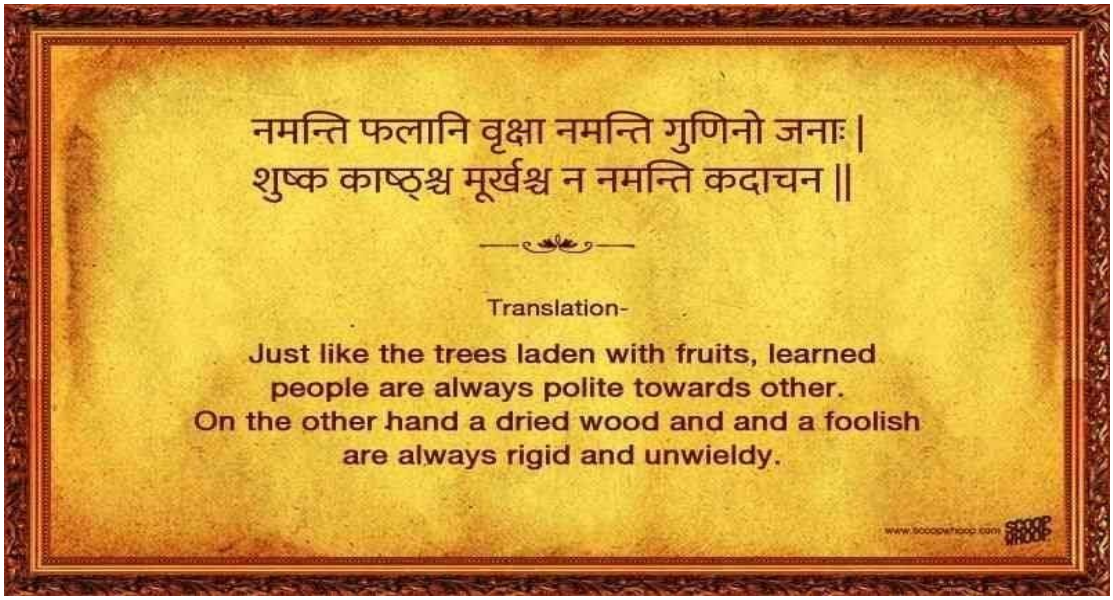

সংস্কৃত ভাষার প্রাক্ ইতিহাস

নিরূপমা বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

সংস্কৃত ভাষা একটি অতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। এই ভাষা বহু কাল ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এই ভাষাই বারেবারে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অমৃতাস্বাদ প্রদান করে চলবে। সংস্কৃত (संस्कृतम् সংস্কৃতম্, সঠিক নাম: संस्कृतवाक्, সংস্কৃতাবাক্, পরবর্তীকালে প্রচলিত অপর নাম: संस्कृतभाषा সংস্কৃতভাষা, "পরিমার্জিত ভাষা") হল একটি ঐতিহাসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম পবিত্র দেবভাষা। বর্তমানে সংস্কৃত ভারতের ২২টি সরকারি ভাষার অন্যতম এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা। ধ্রুপদি সংস্কৃত এই ভাষার প্রামাণ্য ভাষাপ্রকার।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত পাণিনীয় ব্যাকরণ এই প্রামাণ্য রূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে লাতিন বা প্রাচীন গ্রিক ভাষার যে স্থান, বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষার সেই স্থান। ভারতীয় উপমহাদেশ, বিশেষত ভারত ও নেপালের অধিকাংশ আধুনিক ভাষাই এই ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। সংস্কৃতের প্রাক্-ধ্রুপদি রূপটি বৈদিক সংস্কৃত নামে পরিচিত। এই ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা এবং সংস্কৃতের প্রাচীনতম রূপ। এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শনটি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ রচিত। এই কারণে ঋক্বৈদিক সংস্কৃত হল প্রাচীনতম ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলির অন্যতম এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের (ইংরেজি ও অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা যে পরিবারের সদস্য) আদিতম সদস্য ভাষাগুলির অন্যতম।

সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার কাব্য ও নাটকের ঐতিহ্যশালী ধারাদুটি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, দার্শনিক ও হিন্দু শাস্ত্রীয় রচনায় সমৃদ্ধ। তাহাদের ধর্মীয় আচার-আচরণে সংস্কৃত হল আনুষ্ঠানিক ভাষা। এই ধর্মীয় শাস্ত্র ও মন্ত্র সবই সংস্কৃতে লিখিত। কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান আজও কথ্য সংস্কৃতের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে এবং সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার নানা প্রচেষ্টাও করা হয়ে থাকে।

সংস্কৃত ক্রিয়া বিশেষণ সংস্কৃত- ক্রিয়াটির আক্ষরিক অর্থ "'ক্র' সংযুক্ত করা", "উন্নত ও সম্পূর্ণ আকারপ্রাপ্ত", "পরিমার্জিত" বা "সুপ্রসারিত"। শব্দটি সংস্কার ধাতু থেকে উৎসারিত; যার অর্থ "ি সংযুক্ত করা, রচনা করা, ব্যবস্থাপনা করা ও প্রস্তুত করা"। সং শব্দটির অর্থ "সমরূপ" এবং "(স) কার" শব্দর অর্থ "প্রস্তুত করা"। এই ভাষাটিকে সংস্কৃত বা পরিমার্জিত ভাষা মনে করা হয়। এই কারণে এই ভাষা একটি "পবিত্র" ও "অভিজাত" ভাষা। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় ও শিক্ষাদান-সংক্রান্ত

উদ্দেশ্য বলাক প্রচলিত প্রাকৃত ("প্রাকৃতিক, শিল্পগুণবর্জিত, স্বাভাবিক ও সাধারণ") ভাষার পরিবর্তে এই ভাষা ব্যবহৃত হত। এই ভাষাকে "দেবভাষা" বলা হত; কারণ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই ভাষা হল "দেবগণ ও উপদেবতাগণের ভাষা"।

সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দো-ইরানীয় উপপরিবারের সদস্য। এই ভাষার নিকটতম প্রাচীন আত্মীয় হল ইরানীয় আদি পারসিক ও আরবী ভাষাদুটি। বৃহত্তর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন বৈশিষ্ট্যগুলি সারতম ভাষাসমূহ (বিশেষত স্লাভক ওবাগ্রিক ভাষা) এবং গ্রিক ভাষার অনুরূপ।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে গবেষকগণ একটি অনুপ্রবেশ তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বর্তমানে যে ভাষাটি সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে, তার আদি ভাষাভাষীগণ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। এই তত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ বাল্টিক ও স্লাভিক ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অ-ইন্দো-ইউরোপীয় ফিনো-আগরিক ভাষাসমূহের সঙ্গে শব্দভাণ্ডার আদানপ্রদান, এবং উদ্ভিদ ও জীবজগতের নামসংক্রান্ত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রামাণ্য শব্দগুলিকে তুলে ধরা হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীনতম প্রামাণ্য রচনা হল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্য বর্রক শেষ ভাগের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়কার কোনো লিখিত নথি পাওয়া যায় না। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গ্রন্থের মৌখিক প্রচলনটি বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, এই জাতীয় গ্রন্থগুলোর সঠিক উচ্চারণকে ধর্মীয় কারণেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। ঋগ্বেদ সম্পর্কে পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) সংস্কৃত ভাষার বিকাশ লক্ষিত হয় সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ গ্রন্থগুলিতে। এই সময় থেকে এই ভাষার ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, এবং এর সঠিক উচ্চারণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি এই ভাষার বিবর্তনের পূর্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায়। [১৪]

পাণিনিয় অষ্টাধ্যায়ী প্রাচীনতম সংস্কৃত ব্যাকরণ, যা আজও বর্তমান রয়েছে। এটি মূলত একটি প্রামাণ্য ব্যাকরণ। এটি বর্ণনামূলক নয়, নির্দেশমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ। যদিও পাণিনির সময় বেদের কয়েকটি অচলিত হয়ে পড়ে কয়েকটি ব্যাকরণের বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

"সংস্কৃত" শব্দটির দ্বারা অন্যান্য ভাষা থেকে পৃথক একটি ভাষাকে বোঝাত না, বরং বোঝাত একটি পরিমার্জিত কথনরীতিকে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত উচ্চসমাজে স্থান পাওয়া যেত। সাধারণত উচ্চবর্ণের মধ্যেই পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ছিল বিদ্যাচর্চার ভাষা। লোকসাধারণের প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও সমাজে প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য করা যায় প্রাকৃত ভাষা থেকেই পরবতীকালের আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়।

বৈদিক সংস্কৃত :-

মূল বিষয়: পাণিনি কর্তৃক সংজ্ঞায়িত সংস্কৃত পূববর্তী বৈদিক রূপটি থেকে উৎসারিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈদিক সংস্কৃত এবং ধ্রুপদি বা "পাণিনীয়" সংস্কৃত ভাষার দুটি উপভাষা। এই দুই উপভাষার মধ্যে সাদৃশ্য প্রচুর। কেবল ধ্বনিতে, শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ ও বাক্যতরের ক্ষেত্রে দুই ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। সংস্কৃত বেদের ভাষা বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতা, গদ্যভাগব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ বৈদিক সংস্কৃতে রচিত। এই সকল গ্রন্থ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। গবেষকগণ মনে করেন, ঋগ্বেদ সংহিতার ছন্দময় স্তোত্রগুলি এই ভাষার প্রাচীনতম রচনা নিদর্শন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্রুতি পরম্পরায় এই স্তোত্রগুলি রচিত ও স্মৃতি হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে উপনিষদ্ রচিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে বৈদিক সংস্কৃত ধর্মীয় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা থেকে দ্বিতীয় ভাষায় পরিণত হয়। এর ফলে সংস্কৃত ভাষায় ধ্রুপদি যুগের সূচনা ঘটে।

ধ্রুপদী সংস্কৃত:-

প্রায় ২০০০ বছর ধরে একটি সাংস্কৃতিক প্রবাহ দক্ষিণ এশিয়া, অন্তঃ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার কিয়দংশকে প্রভাবিত করে। [১৫] বেদোত্তর সংস্কৃত ভাষার প্রধান রূপটি পরিলক্ষিত হয় হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে। এই দুই মহাকাব্য পাণিনীয় ব্যাকরণ থেকে বিচ্যুতি লক্ষিত হয়, তার কারণ প্রাক্-পাণিনীয় প্রভাব নয়, বরং প্রাকৃত প্রভাব। [১৬] প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই চ্যুতিকে বলেছেন আষষ (আষষ) বা ঋষির দ্বারা উক্ত। কোথাও কোথাও একে ধ্রুপদি সংস্কৃত না বলে প্রাকৃতবাদ বলা হয়েছে। বৌদ্ধ সংকর সংস্কৃত হল একটি মধ্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা, যা বিভিন্ন দিক থেকে ধ্রুপদি সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ প্রাকৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধদের আদি ধর্মগ্রন্থগুলি রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তৈত্তিরীয় (১৯৫৫) মতে, ধ্রুপদি সংস্কৃতের চারটি প্রধান উপভাষা ছিল: প্রথমোত্তরী (উত্তর-পশ্চিম, উত্তর বা পশ্চিম নামেও পরিচিত ছিল), মধ্যদেশী (মধ্য অঞ্চল), পূর্বী (পূর্বাঞ্চল) ও দক্ষিণী (দক্ষিণাঞ্চল, ধ্রুপদি যুগে উদ্ভূত)। প্রথম তিনটি উপভাষার উৎস বৈদিক ব্রাহ্মণ। এগুলির মধ্যে প্রথমটিকে শুদ্ধতম মনে করা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্য সূচিত হয় বেদ রচনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধযুগীয় ভারতে রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ থেকে আদি মধ্যযুগ (মোটামুটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী) পর্যন্ত চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে অবক্ষয় যুগ শুরু হওয়ার পূর্বেও

একাদশ শতকে এই সাহিত্য আর একবার বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্তমান কালে সংস্কৃত পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা চলছে তার হিসেবে ২০০২ সাল থেকে সর্বভারতীয় সংস্কৃত উৎসব চালু হয়েছে। এই উৎসবের লক্ষ্য সংস্কৃত সাহিত্যকে উৎসাহ দান করা।

হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলি সবই সংস্কৃতে লেখা। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলিও হয় সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অথবা সংস্কৃত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই কারণে ভারতীয় সংস্কৃতিতেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

1. গোস্বামী, বিজয়া: তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪০৪ (বঙ্গাব্দ)।
2. বন্দোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন : সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫ (জানুয়ারি)।
3. বসু, রত্না : ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭।
4. শ, রামেশ্বর : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ (বঙ্গাব্দ)।

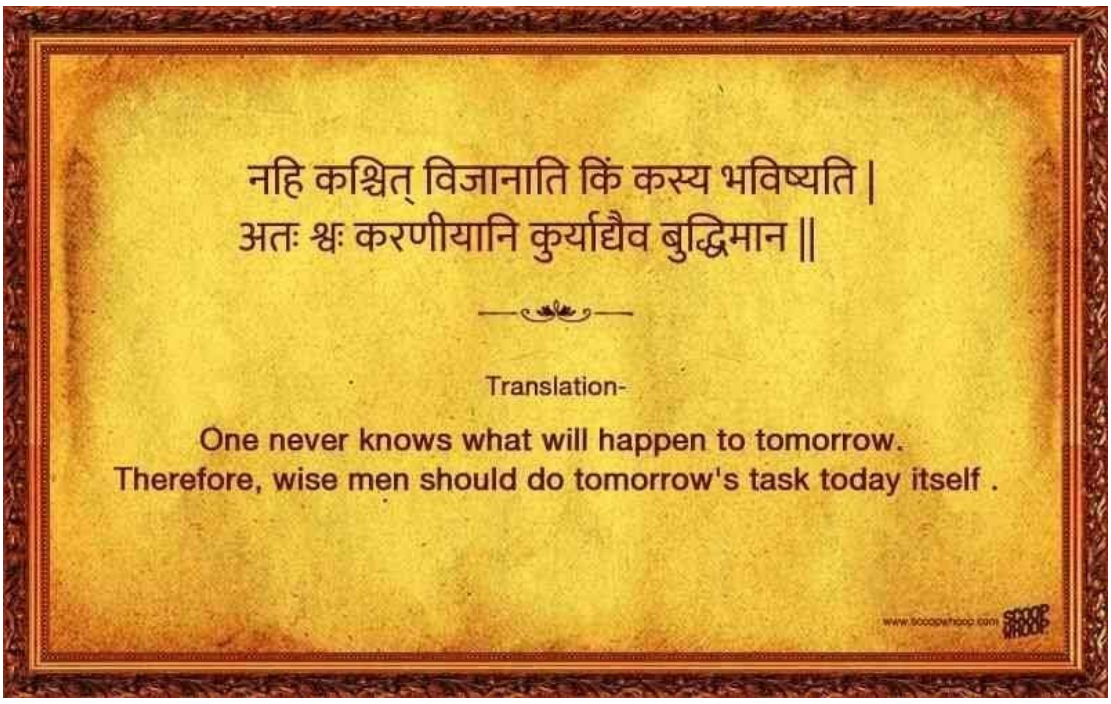

কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি

শিউলি হানিপ
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

কালিদাস প্রকৃতির কবি। প্রকৃতি বর্ণনায় কালিদাসের বিশিষ্টতা আছে, আর এই বিশিষ্টতা হলো প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা। কালিদাসের প্রতিভার ব্যাপকতা বিস্ময়ের বিষয়। মনুষ্যলোক, দেবলোক, যক্ষলোক, নাগলোক, জ্যোতির্লোক তাছাড়া কীট-পতঙ্গ-মৃগ-পক্ষী-জলচর-স্থলচর-উভচর সমস্ত প্রকার প্রাণী, জীবজন্তু, স্থাবর-জঙ্গম বিষয়ে ধর্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ক সর্বশাস্ত্রে সর্ববিদ্যায় এমন সম্যক্ জ্ঞান যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়। ভামহ যথার্থই বলেছেন—

‘ন তচ্ছিল্পং ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।

জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভাবো মহান্ কবেঃ।। ’

একজন মহাকবিকে সর্বশাস্ত্রে সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। প্রকৃতিরাজ্য ও জীবজগতের সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাদৃষ্টি থাকে কবিদের। অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা, নদ-নদী, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত নিয়ে কাব্যরচনা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু-একজন মাত্র প্রকৃতি ও মানুষের আত্মীয়তা অনুভব করতে সমর্থ হন। ইংরেজ কবি Shakespears ও Wordsworth এর মধ্যে এই প্রকৃতি উপলব্ধ হয়। ভারতের কবি কালিদাস নিসর্গপ্রেমের বর্ণনায় বিশ্বের কবি সমাজে প্রথম স্থানের অধিকারী। ‘মেঘদূত’ কাব্যে কবির প্রকৃতি প্রেমিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে। কবি দৃষ্টিতে পূর্বমেঘের নদী শুধু নদী নয়, তাঁর কাছে রেবা পিপাসাময়ী। নির্বিন্ধ্যা রমণীয়া, শিপ্রা উপেক্ষিতা, সুচতুরতা গন্ধবতী, সরস্বতী নিক্কণময়ী, চর্মণ্বতী কুণ্ঠাকাতরা। আবার অলকা কখনও স্বয়ং বরা। কখনও আত্মহারা, কখনও খণ্ডিতা, কখনও বা ভ্রূধস্বা। ‘ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতরূপী মেঘ ও লেখকের দৃষ্টিতে বিচ্ছেদবেদনাতুর চেতনপদার্থরূপে আভাত হইয়াছেন। ’ (কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)

কালিদাসের ‘ঋতুসংহার’, ‘কুমারসম্ভব’, ‘রঘুবংশ’, ‘বিক্রমোবর্শীয়ম্’, ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ সর্বত্রই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যাবে। ‘ঋতুসংহার’-এ ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে মানবজীবনেও যে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘কুমারসম্ভব’-এ হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায়, পার্বতীর প্রকৃতি প্রীতিতে চেতনাচেতনের যে ঐকান্তিক অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা জগতের সাহিত্যে দুর্লভ; আর ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা, কণ্ব, দুষ্যন্ত যেমন,

তপোবন প্রকৃতি ও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র --- ‘প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এতকার্যসাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই। ’ (প্রাচীন সাহিত্য - রবীন্দ্রনাথ) মূক ও জড় প্রকৃতিও কালিদাসের কাব্যনাটকে অনুভূতিময়। স্থাবর-জঙ্গম সকলেই পরস্পরের সুখ-দুঃখ অনুভব করে। ‘শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট করেছে। এই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ‘রঘুবংশ’ প্রকৃতি বর্ণনার অফুরন্ত ভাণ্ডার। মহারাজ দিলীপ চলেছেন কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে। শুরু হয়েছে যাত্রাপথের উভয়পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা। নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত দিলীপ, সেখানেও প্রকৃতি বর্ণনা। সুরভিতনয়া নন্দিনীকে নিয়ে বনে প্রবেশ করেছেন মহারাজ দিলীপ। অরণ্যের বৃক্ষরাজি বিহগের কলরবছলে রাজার জয়গান করতে লাগলো; বায়ুতাড়িত তরুলতাসমূহ রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো, মনে হল যেন পুরবালারা লাজাঞ্জলি দিয়ে রাজাকে দর্শন করতে লাগলো; পাহাড়ী ঝরণার হিমকণায় সিক্ত পুষ্পগন্ধবাহী মৃদুমন্দ বাতাস রাজার সেবা করতে লাগলো। রাজা বনভূমির শোভা দর্শন করতে লাগলেন ---

“স পল্বলোতীর্ণবয়াহযূথান্যাবাসবৃক্ষোন্মুখবর্হিণানি।

যযৌ মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলানি শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্।।”

রঘুর দিগ্বিজয় দৃশ্যে নানা দেশের বর্ণনা, ভারতসহ বহির্ভারতের বর্ণনা, আর সারা ভারতবর্ষের নদ-নদী-নগরীর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের চারুত্ব বর্ণনায় কবির প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের বনবাস সেখানেও প্রকৃতি। সীতা উদ্ধার করে পুষ্পক রথে আকাশ পথে আযোধ্যায় ফিরছেন রামচন্দ্র সেখানেও প্রকৃতি তার মনোহারিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত। সমুদ্রদর্শনে সীতাকে রামচন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তি ---

“দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।”

এই সেই শ্যাম বট যার কাছে সীতা ‘বনবাস উদ্‌যাপন পূর্ণহোক্’ এই প্রার্থনা করেছিলেন। সীতার চরণ বিচ্ছেদে দুঃখে মৌন নূপূর ---

“সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপূরমেকমূর্ব্যাম্।

অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্।।”

সরযূনদীকে রামচন্দ্র বলছেন ---

"মেয়ং মদীয়া জননীব তেন মান্যের রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।

দূরে বসন্তং শিশিরানিলেমাং তরঙ্গহস্তেরূপহূতীব।।"

স্বামী পরিত্যক্তা দুঃখ বিদীর্ণা সীতা সান্ত্বনা দিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি যখন বলছেন ---

"পয়োঘটেরাশ্রমবালবৃক্ষাণ্ সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।

অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয় প্রীতিমবাস্যসি ত্বম্।।"

এইরূপ প্রকৃতি বর্ণনা 'রঘুবংশ'-এ সর্বত্র দেখা যাবে 'মানুষ ও প্রকৃতি কালিদাসের কাব্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, উভয়ই একসূত্রে গাঁথা, এক সুরে বাঁধা। 'কালিদাস ধন্য কবি-কুল-পতি। '

কালিদাস যত বড় কবি, তত বড় নাট্যকার। 'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্। ' কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গে বসন্তসমাগমে এবং মদনভস্মের শ্লোকগুলিতে পাঠকের মনে হবে যেন কোনও নাটকের অভিনয় দেখছেন। নিজের অলৌকিক অসাধ্যসাধনশক্তিতে বিশ্বাসী মদগর্বী মদন সখা বসন্ত ও পত্নী রতিকে নিয়ে এসেছেন কৈলাসে মহাযোগী মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করতে। সমস্ত প্রকৃতিরাজ্য কন্দর্পের প্রভাবে নব অনুরাগে রঞ্জিত ---

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।

শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ।।"

অকাল বসন্তের শুভাগমনে চেতনাচেতনের ঈদৃগ্ ভাবান্তর লক্ষ্য করে ভক্তরাজ নন্দী মুখের উপর তর্জনী সংকেতে সকলকে সাবধান করে দিলেন। নন্দীর প্রতাপে সমগ্র বনভূমি চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য নিস্পন্দ; অপূর্ব সাজে সজ্জিতা নগ-নন্দিনী উমা এসে উপস্থিত। সুযোগ বুঝে 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' মদন কুসুমশর নিক্ষেপ করলেন শংকরকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্তদেবতারা ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধসংবরণ করুন বলতে না বলতেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ হল, যোগিবরের তৃতীয়নেত্রের বহ্নি ভস্মীভূত করলো মদনকে ---

"ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।

তাবদ্ স বহ্নির্ভবনে এজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।।"

কাব্যের এই অংশ নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। পাঠকের মনে হবে তিনি কোন নাটকের অভিনয় হতে দেখছেন। পঞ্চমসর্গে ছদ্মবেশী বিরূপাক্ষ উমার আশ্রমে উপস্থিত, সেখানে নাটকীয় সংলাপ, ঘটনার গতিময়তা সব কিছুই মুগ্ধ করবে পাঠককে। মহাকবির মেঘদূত বিরহীযক্ষের একক সংলাপে একখানি নাট্যকাব্যই।

'রঘুবংশ'-এ দিলীপ ও মায়াসিংহের সংলাপ, তৃতীয় সর্গে ইন্দ্র ও রঘুর বাঙ্‌বিনিময়, অষ্টমসর্গে ইন্দুমতীর বিরহে অজ বিলাপ বর্ণনায় এই সংলাপধর্মিতা যা দৃশ্যকাব্যের প্রাণ তা পর্যাপ্ত পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চমসর্গে রঘু ও কৌৎসের কথোপকথন, চতুর্দশ সর্গে গুপ্তচরমুখে সীতা সম্বন্ধে প্রজাদের মনোভাব জ্ঞাপন। রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ করা। শোকবিহ্বল অবস্থা, লক্ষণের আজ্ঞাপালন ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনাতেও নাট্যধর্মিতা আছে।

"শ্রীকালিদাসস্য বচো বিচার্য
নৈবাণ্যকাব্যে রমতে মতির্মে।
কিং পারিজাত্যং পরিহৃত্য হন্ত
ভৃঙ্গলিরানন্দতি সিন্ধুবারে।।"

'কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে!
শুনিয়াছি লোকমুখে আপনি ভারতী।
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে।
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণবীণা অরপিলা করে!
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে।)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

(মধুসূদন-কালিদাস কবিতা)

গ্রন্থপঞ্জী

১) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, চক্রবর্তী সত্যনারায়ণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণি কোলকাতা - ৭০০০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৮।

২) ভট্টাচার্য পার্বতীচরণ, মেঘদূত পরিচয়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কোলকাতা - ৬, মুদ্রণ ৩২ মদন মিত্র লেন, কোলকাতা - ৬।

৩) অধ্যাপক ড. মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কোলকাতা- ১৪১৯ (১লা বৈশাখ ১৪২৬- দ্বিতীয় পরিমার্জিত প্রকাশ।)

৪) গোপ যুধিষ্ঠির, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো ২৮/১ বিধান সরণী কোলকাতা - ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ - জুলাই ২০০৯, সেপ্টেম্বর ২০১০।

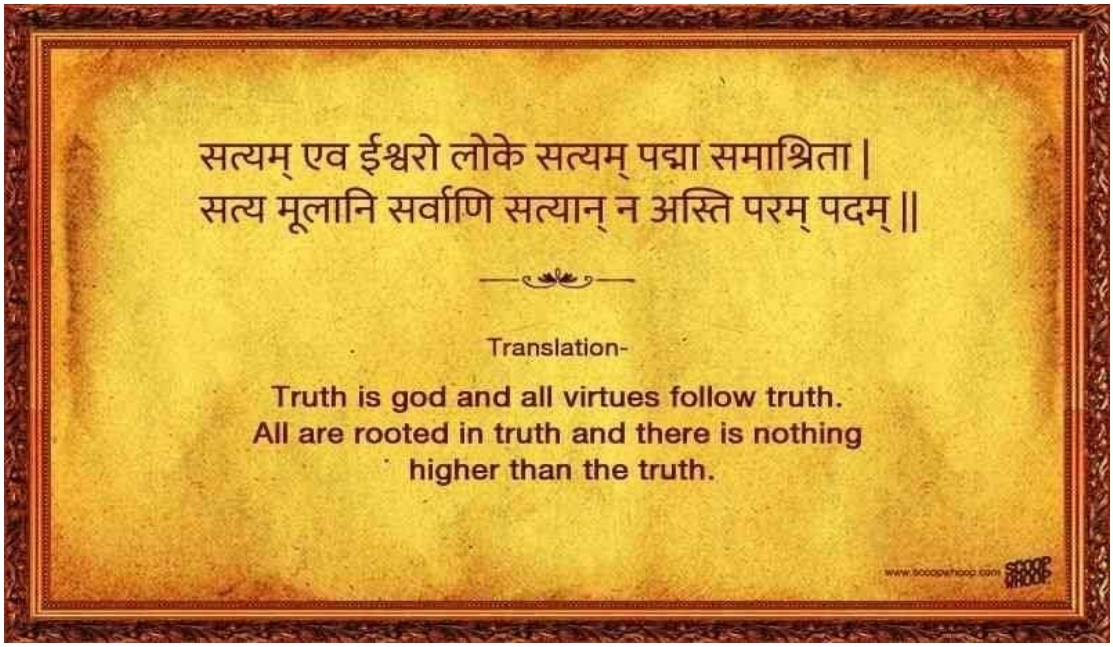

সংস্কৃত সাহিত্যে গণিতশাস্ত্র চর্চা

মঞ্জু ঘোষ
সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপিকা

ভূমিকা :

গণিত শব্দটির অর্থ সংখ্যা বা অঙ্ক গণনার দ্বারা যে পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। 'গণ' শব্দের অন্য অর্থ হল সমষ্টি, সুতরাং ব্যষ্টি বা সমষ্টির দ্বারা নির্ণয় পদ্ধতির নামও গণিত। গণিতের দুটি প্রধান শাখা— সংখ্যা গণিত (অর্থাৎ পাটিগণিত ও বীজগণিত) এবং আকৃতি গণিত (অর্থাৎ জ্যামিতি)। প্রাচীন ভারতে পাটিগণিত ও জ্যামিতিবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রয়োজনে নানারূপ বেদি নির্মাণ করতে গিয়ে জ্যামিতি বিষয়ক বিশিষ্ট ধ্যানধারণার উদ্ভব হয়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত বিবিধ শুল্বসূত্রে প্রাচীন গাণিতিক পদ্ধতির সূচনা দেখা যায়। পূর্ণসংখ্যা, দশমিক পদ্ধতি ও অন্যান্য গাণিতিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগে ভারতের গৌরবময় অবদান অনস্বীকার্য। জ্যোতির্বিদ্যাকে উন্নত করতে গিয়েও গণিত চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের একটি শ্লোকে গণিতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে— "...বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধ্নি স্থিতম্। " এক থেকে দশ এবং দশের গুণিতক বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। সংখ্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরিলক্ষিত হয় যজুর্বেদে। সংখ্যা লিখন পদ্ধতি কোথায় কবে প্রথম উদ্ভব হয়েছিল এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত লিপি, ফলক, উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও ভারতীয়রা সংখ্যা লিখন পদ্ধতি জানতেন।

পাটিগণিত :

প্রথমদিকে ভারতীয় গণিতশাস্ত্র পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত ছিল না। 'পাটী' কথাটির অর্থ হল— যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রকরণের ক্রমপ্রকাশ। 'পাটী' শব্দের আর একটি অর্থ হল 'ফলক'। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা সমস্যা সমাধান করতেন। এই পদ্ধতিকে 'ধূলিকর্ম' নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে পাটীগণিত নামক বিশিষ্ট শাখার প্রচলন ঘটে অনেক পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হাত ধরে।

পদ্ধতিগতভাবে পাটীগণিত রচিত হয় প্রথম আর্যভট্টের সময় থেকে। ভারতীয় পাটীগণিত কুড়িটি পরিকর্ম ও আটটি ব্যবহারের আলোচনায় সমৃদ্ধ। কুড়িটি পরিকর্ম হল— সংকলিত, ব্যবকলিত, গুণন, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, পঞ্চজাতি, ত্রৈরাশিক, ব্যস্ত ত্রৈরাশিক, পঞ্চ রাশি, সপ্তরাশি, নবরাশি,

একাদশরাশি ও বন্দ-প্রতিবন্দ। আটটি ব্যবহার হল— মিশ্রক, শ্রেঢ়ী, ক্ষেত্র, ঘাট, চিতি, ক্রাকশিক, রাশি ও ছায়া। কুড়িটি পরিকর্ম ও আটটি ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রহ্মগুপ্ত যথার্থ গণিতজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন—

"পরিকর্ম বিংশতিং যঃ সংকলিতাদ্যাং পৃথক্ বিজানাতি।
অষ্টৌ চ ব্যবহারান্ ছায়ান্তান্ ভবতি গণকঃ সঃ।।"

প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের মধ্যে প্রথম আর্যভট্টের 'আর্যভট্টীয়' গ্রন্থের গণিতাধ্যায়, ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা যাকে যোগ এবং বিয়োগ বলি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে এ দুটির অনেক পারিভাষিক নাম ছিল। যেমন— যোগের পরিবর্তে সংকলন, মিশ্রণ, সম্মেলন, সংযোজন এবং বিয়োগের পরিবর্তে ব্যুৎকলন, শোধন, পাতন, অন্তর প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দ্বিতীয় আর্যভট্ট, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য প্রভৃতি গ্রন্থে অবশ্য যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশ সম্পর্কে পূর্বে নানা আলোচনা থাকলেও সঠিক পদ্ধতিগত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে প্রথম আর্যভট্টের সময় থেকে। ব্রহ্মগুপ্ত চারপ্রকার গুণের উল্লেখ করেছেন— (১) গোমূত্রিক (২) খণ্ড (৩) বেধ (৪) ইষ্ট। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। বর্গের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে প্রঘম আর্যভট্ট বলেছেন— "বর্গসমচতুরশ্র ফলঞ্চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ" অর্থাৎ একটি সমচতুরশ্রের চারটি পার্শ্ব সমান হলে তার দ্বারা উৎপন্ন ক্ষেত্রফলকে বর্গ বলে। ঘন সম্পর্কে আর্যভট্টের অভিমত হল— "সদৃশত্রয়সংবর্গো ঘনস্তথা দ্বাদশাশ্রিঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ তিনটি সমান সংখ্যার গুনফল এবং যে বস্তুর ১২ টি পার্শ্ব আছে তাকে ঘন বলে।

বীজগণিত : ভারতবর্ষে বীজগণিত চর্চার সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে অর্থাৎ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ শতকে। শুল্বসূত্রেও নিহিত আছে বীজগণিতের নানান তত্ত্ব। ব্রহ্মগুপ্ত বীজগণের পরিবর্তে 'কুট্টক গণিত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ চূর্ণন বা বিশ্লেষণ। অনেকে একে বলেছেন 'অব্যক্ত গণিত'। 'বীজগণিত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন পৃথুদকস্বামী। বীজগণিতের যে গণিতজ্ঞদের আনন্দের কারণ সে কথা বলতে গিয়ে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বলেছেন—

"উক্তং বীজোপযোগীদং সংক্ষিপ্তং গণিতং কিল।
অতো বীজং প্রবক্ষামি গণকানন্দকারণম্।।"

বীজগণিতে দুটি ধনাত্মক রাশির বা দুটি ঋণাত্মক রাশির যোগ হয়ে থাকে। একটি ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক হলে তাদের অন্তরই যোগ হয়। বিযোজ্য ধনাত্মক হলে বিয়োগের ক্ষেত্রে তা ঋণ হবে এবং ঐ ধরনের ঋণরাশি ধন হবে। অতঃপর এদের যোগ করতে হবে।

গুণের নিয়ম সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন যে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশিদ্বয়ের গুণফল ঋণাত্মক, দুটি ঋণাত্মক রাশির গুণফল ধনাত্মক এবং দুটি ধনাত্মক রাশির গুণফল ধনাত্মক হয়—

$$a \times (-b) = -ab$$

$$a \times b = ab$$

$$-a \times (b) = -ab$$

একমাত্রার সরল সমীকরণ, একমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ, ত্রিঘাত ও উচ্চঘাত বিশিষ্ট সমীকরণের আলোচনাও করেছেন প্রাচীন গণিতবিদ্‌গণ। সুতরাং আধুনিক বীজগণিতের ক্রমবিকাশের পথে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অবদান বিশেষ প্রশংসার্হ।

জ্যামিতি :

গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আর্য ঋষিরা জ্যামিতির বহুল আলোচনা করেছেন। তাই গণিতশাস্ত্রের যে শাখাটি প্রাচীন ভারতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল জ্যামিতি। বৈদিক যুগে বীজগণিতের উৎপত্তি যে জ্যামিতির অঙ্কনরীতির মধ্যে নিহিত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় ত্রিকোণমিতিও জ্যামিতিভিত্তিক। বৈদিক যাগযজ্ঞ করার সময় যজ্ঞবেদী নির্মাণের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায় শুল্বসূত্রে।

শুল্বসূত্রসমূহে অনেক জ্যামিতিক উপপাদ্য পরিলক্ষিত হয়। বৌধায়নের শুল্বসূত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের ধারণাটি বিবৃত। শুল্বসূত্র, রচনাকালের পর থেকে প্রথম আর্যভট্টের কাল পর্যন্ত ভারতীয় জ্যামিতিতে জৈনদের অপরিসীম প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে গণিতশাস্ত্রের একটি অংশ হিসাবে যে সকল গ্রন্থে জ্যামিতির আলোচনা পরিলক্ষিত হয় তাদের মধ্যে প্রথম আর্যভট্টের 'আর্যভট্টীয়', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্ম-স্ফুটসিদ্ধান্ত', প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্যভট্টীয়ের গণিত অধ্যায়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, পিরামিডের আয়তন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল, গোলকের আয়তন, প্রভৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' গ্রন্থটি তো জ্যামিতিশাস্ত্রের বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যের আলোচনায় সমৃদ্ধ। মহাবীরাচার্য ত্রিভুজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— "তিস্রো ভুজা যস্য ক্ষেত্রসা তদিদং ক্ষেত্রং ত্রিভুজম্।" আর্যভট্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন— ত্রিভুজের বাহুত্রয় ক, খ, গ হলে ধরি

$$\text{অ (অর্ধপরিসীমা)} = \frac{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}}{২}$$

তাহলে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল—

$$\sqrt{\text{অ}\,(\text{অ} - \text{ক})(\text{অ} - \text{খ})(\text{অ} - \text{গ})}\ \text{বর্গএকক}$$

উপসংহার :

গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ মিশরকে, কেউ বা ব্যাবিলনকে আবার কেউ বা ভারতবর্ষকে গণিতশাস্ত্রের সূতিকাগৃহরূপে চিহ্নিত করেছেন। ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যে গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ যখন সভ্যতার অরুণালোক দেখেনি সেই সময় গণিতের চর্চা ভারতভূমিতে অব্যাহত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে গণিতশাস্ত্রের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা ভারতভূমিতে পল্লবিত হয়েছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণীষীদের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে বিজ্ঞানের জগতে বিশাল মহীরূহে পরিণতি লাভ করেছে।

তথ্যসূচী :

১) ঋক্‌সংহিতা – ১/১৫/৪

২) ঋক্‌সংহিতা – ১/১৫/১০

৩) ঋক্‌সংহিতা – ৮/২২/৩২

৪) ঋক্‌সংহিতা – ৮/১/৯

৫) ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত – ১০/৬২

৬) ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত – ১০/১২

৭) লীলাবতী – ২/১৫/৬

৮) গণিতসারসংগ্রহ – ৭/৫

৯) আর্যভট্টীয়, গণিতপাদ, শ্লোক – ৬

গ্রন্থপঞ্জি :

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, edited দেবকুমার দাস, ১৪০৪, সন্দেশ, Print.

২। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৩। ভারতের শিক্ষার ইতিহাস, নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৭০, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। বৈদিক গণিত শাস্ত্র, এম. এল. ব্যাস, মঙ্গল প্রকাশন।

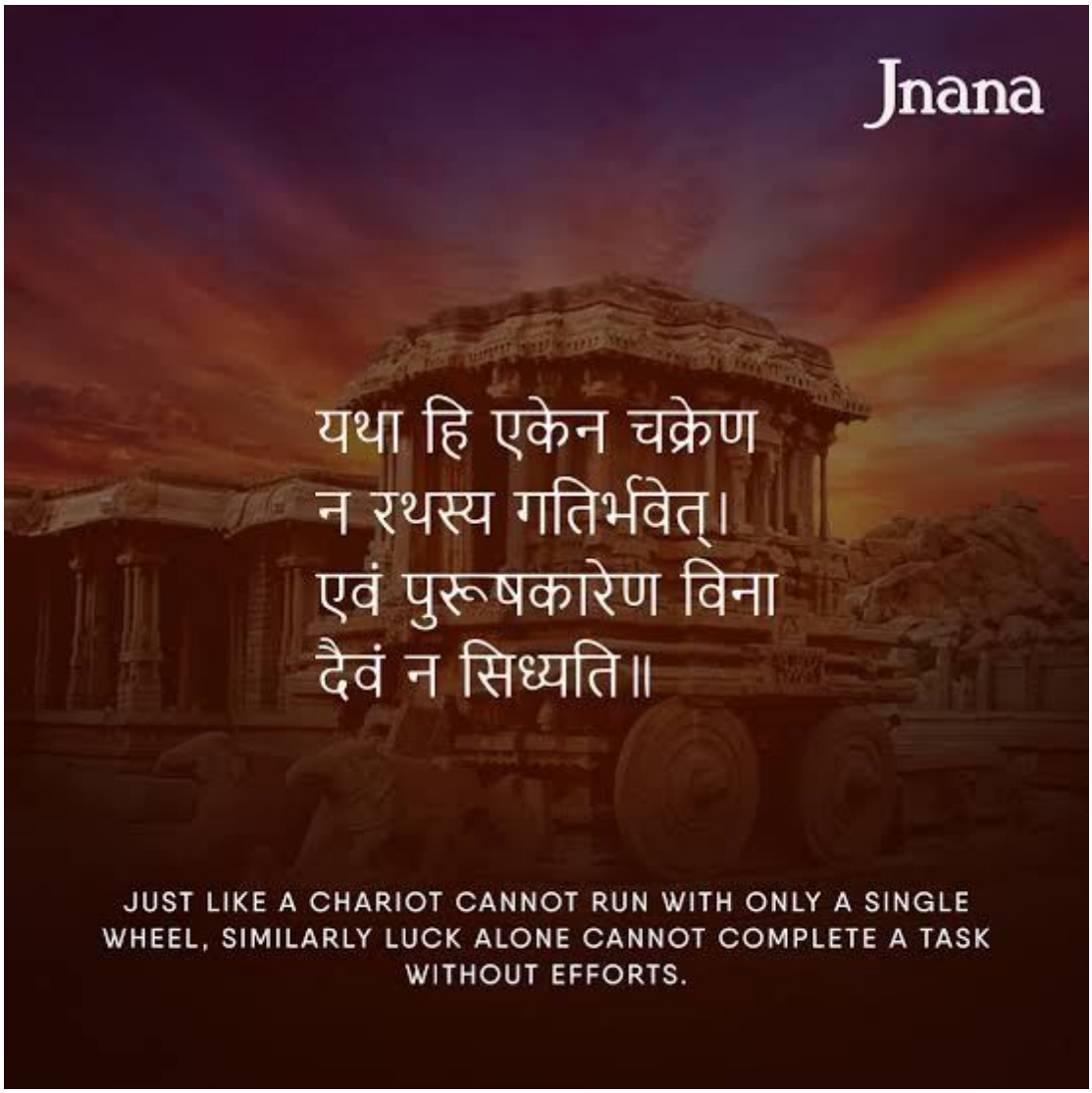
Jnana
यथा हि एकेन चक्रेण
न रथस्य गतिर्भवेत्।
एवं पुरूषकारेण विना
दैवं न सिध्यति॥
JUST LIKE A CHARIOT CANNOT RUN WITH ONLY A SINGLE WHEEL, SIMILARLY LUCK ALONE CANNOT COMPLETE A TASK WITHOUT EFFORTS.

সংস্কৃত ভাষার ইতিবৃত্ত

রিয়া বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপিকা

সংস্কৃত (সংস্কৃত উচ্চারণ : সংস্কৃতম্, সঠিক নাম : সংস্কৃতা বাক্, পরবর্তীকালে প্রচলিত অপর নাম : সংস্কৃতভাষা, "পরিমার্জিত ভাষা") হল একটি ঐতিহাসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দেবভাষা। এটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান দুই বিভাগের একটি "শতম্" ভুক্ত ভাষা। বর্তমানে সংস্কৃত ভারতের ২২টি সরকারী ভাষার অন্যতম এবং উত্তরাখন্ড রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত পাণিণি-র ব্যাকরণে এই প্রামাণ্য রূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে লাতিন বা প্রাচীন গ্রিক ভাষার যে স্থান, বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষার যে স্থান, বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষার সেই স্থান। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে সাধারণ শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষ একটি মাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, সে তার সংস্কৃতভাষা। "

সংস্কৃত কেন গুরুত্বপূর্ণ :

১) ব্যাকরণের যথার্থতা, অভিব্যক্তির সৌন্দর্য এবং সংস্কৃত শব্দ পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া যায় না। এটি অন্যান্য সকল ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। এটি অন্যান্য সকল ভারতীয় ভাষার জন্য ভিত্তি প্রদান করে যেমন গ্রিক এবং ল্যাটিন পশ্চিমা ভাষার জন্য।

২) ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্কৃতের উপর নির্ভর করে। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাভারত এবং রামায়ণের মত মহাকাব্য যোগসূত্র সবই সংস্কৃত ভাষায়। এগুলিই ভারতকে একত্রিত করেছে।

৩) কালিদাস, ভারবি, বাণভট্ট, ভর্তৃহরি ইত্যাদি কবিদের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ, এমন নয় যে এটি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি অর্থ, রাজনীতি, আইন মানসিক স্বাস্থ্য, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং অন্যান্য অনেক বিষয়সহ সমস্ত মানুষের চাহিদা পূরণ করে।

৪) এটি সমগ্র মানবতার জন্য প্রযোজ্য মূল্য প্রদান করে এটি কেবল একজন ব্যক্তির জন্য একটি আশা প্রদান করে না যে সে ঐশ্বরিক স্তরে উঠতে পারে এবং সেই ধারণার মাধ্যমে একজন অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং এভাবে সমগ্র বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

সংস্কৃত-এর সৌন্দর্য / The Beauti of Sanskrit -

বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা বর্তমান ভাষাগুলির মধ্যে যা ল্যাটিন বা গ্রিকের মতো একটি প্রাচীনকালের অধিকারী, সংস্কৃত একমাত্র ভাষা যা তার প্রাচীন বিশুদ্ধতা ধরে রেখেছে। এটি অতীতে যেমন ছিল আজও তার গঠন এবং শব্দভান্ডার বজায় রেখেছে।

২। একটি ভাষা যতটা আধুনিক হতে পারে এমনকি এখন, আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের সাথে সাথে সংস্কৃত ভাষায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষ কথা বলে। টেলিভিশন রেডিওর মাধ্যমে ভারত সরকার প্রদত্ত সংবাদ পরিষেবাটি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিষেবাটি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন করে দৈনিক সংস্কৃত অনুষ্ঠান দেখায়।

ভারতে সংস্কৃত ভাষায় পেশা

দোভাষী অনুবাদক : এরা কমপক্ষে দুই বা ততোধিক ভাষায় সাবলীল। দোভাষীরা কথ্য ভাষার সাথে কাজ করে এবং এটিকে দ্বিতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রযুক্তিগত লেখক : এরা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত নিবন্ধ, নির্দেশিকা লেখে।

কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ : (CSR) এরা কোম্পানি ও ব্যবসার দ্বারা নিযুক্ত এবং গ্রাহকদের কল ফিল্ডিং, অর্ডার প্রসেস করা এবং প্রশ্নের উত্তর দেয়।

পোস্ট সেকেন্ডারি শিক্ষক : এঁনারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। এঁনারা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

নৃবিজ্ঞান - এঁনারা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা এবং লোকগোষ্ঠী অধ্যয়ন করতে আগ্রহী।

ভারতীয় জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত ধর্ম-কর্মাদি করা হয় এবং যে ভাবধারা অবলম্বনে করা হয় তার মূলে রয়েছে বেদ ও উপনিষদ্। বস্তুত যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত হতে পারেন না। জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ার এর মতে, —

“উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতি বিধায়ক আর কোনও গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে।”

জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ জ্ঞানের আলোকে নিজ অন্তর-সত্ত্বায় নিজেকে বিকশিত করে- যা মানবিক মূল্যবোধের পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু অসংযত লোভ, পরস্পরের প্রতি বৈষম্যতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নানা কারণে মানবিক মূল্যবোধে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই পৃথিবীকে সুস্থ, সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য মানুষকে নিরন্তর কর্ম করে যেতে হবে ফলের আশা দূরে সরিয়ে রেখে। ফলত পরিবেশের কল্যাণের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ রক্ষিত হবে।

ঋগ্বেদের ধর্মসূক্তগুলির দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিন্তাধারা, সভ্যতা, সমাজ সংস্কৃতিকে জানার পক্ষে এর মূল্য অপরিসীম। অক্ষ সূক্তে তৎকালীন সমাজে পাশাখেলার প্রতি আসক্তি বশতঃ সে সর্বস্বান্ত হয়েও অক্ষক্রীড়ার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারে না। সকল পরিজন তাকে ত্যাগ করে। অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তরের সমৃদ্ধ শালী মানুষ ও নিচুস্তরের দরিদ্র মানুষের শ্রেণী বৈষম্য ফুটে ওঠে। পরিশেষে সেই দুয়ারী নিজ ভুল বুঝতে পেরে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করে। যা সমাজের উত্তরণের পথকে ত্বরান্বিত করে।

"অক্ষৈর্মা দিব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ববিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।" (১০/৩৪/১৩)

ঋগ্বেদে ধর্ম, জগৎ ও জীবন, সৃষ্টিরহস্য একেশ্বরবাদ প্রভাত বিষয়ে উচ্চতর চিন্তা নিয়ে রচিত দার্শনিক সূক্তগুলি ঋষি-কবিদের মনন ও চিন্তার বিচিত্র প্রকাশ। পুরুষ সূক্তে জগৎ স্রষ্টার বিশ্বব্যাপী রূপের আভাস স্পষ্ট। সৃষ্টির সূচনায় পুরুষ কিভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন। কিভাবে সেই একক সত্তা স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হল তার কাব্যধর্মী বর্ণনা এখানে উল্লেখিত। - "পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে 'Black Hole Theory'- এতে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে – জগতের উৎপত্তির পূর্বে তা গ্রহণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জলে আচ্ছন্ন ছিল। বৈদিক ঋষির এই অনুভূতিতে ফুটে উঠেছে সর্বব্যাপী এক মহাশূণ্যতার চিত্র।

বৈদিক সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণ প্রতিলোম ও অনুলোম বর্ণ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ বৃত্তির ব্যবস্থা প্রভৃতির তথ্য যুজুর্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায়।

অথর্ববেদ ইন্দ্রজাল মূলক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্মের পরিচয়, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ প্রাচীন আর্যদের রীতিনীতি, ভাবধারা, তৎকালীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতি জানার পক্ষে মূল্যবান দলিল। যা লোকহিতৈষণার পরিচয়বাহী। এই সময় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যতার ফলস্বরূপ নারীদের চরম শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছে। গুণ ও কর্মের যথাযথ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

শরীর গঠনকারী ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় এনে বিভিন ব্যাধির প্রকোপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ-এর উপায় বর্ণিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-এ। ব্রহ্মার রচিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-এর আটটি অঙ্গ- শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা,

ভূতবিদ্যা, কোমার ভৃত্য, অগদ, রসায়ন এবং বাজীকরণ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চরকসংহিতা'-য় বলা হয়েছে-

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমম্।
রোগাস্তসাপহর্তারং শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।"

সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখিত 'কামশাস্ত্র'-এ বলা হয়েছে— কাম মূলত 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' হলেও তা যদি সঠিক পথে অনুসৃত হয়, সেই কাম যদি ধর্ম ও অর্থান্বিত হয় তবে তা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। কামশাস্ত্র এক ধরনের প্রায়োগিক বিজ্ঞান এবং এর প্রয়োগব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সংস্কৃতে লৌকিক সাহিত্যকে আমরা ৩টি ভাগে ভাগ করতে পারি- প্রাক্ কালিদাস যুগ, কালিদাস যুগ, কালিদাসোত্তর যুগ।

প্রাক্ কালিদাস যুগের কবিরূপে অশ্বঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রের কবির অনায়াস দক্ষতা। তাঁর রচিত 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে জীবনাসক্তির মদিরতা এবং জীবন-বৈরাগ্যের অনুপম সৌন্দর্য। কবি অশ্বঘোষ মহাকাব্য দ্বয়ের মতো দৃশ্যকাব্যগুলিতেও স্বয়ং সম্পৃক্ত হয়েছেন তাঁর দর্শনবোধের সান্দ্রতা ও তীব্র অনুভূতি নিয়ে।

সংস্কৃত সাহিত্যে অপরাপর লেখকগণের তুলনায় বৈচিত্র্যে, উৎকর্ষে, কবি-প্রতিভার নিরিখে চরিত্র-সৃষ্টিতে, অলংকার প্রয়োগে, ভাষার প্রয়োগে, ভাবের সন্নিবেশে, প্রকৃতি চিত্রণে কালিদাস-এর সমকক্ষ কেউই নেই।

কালিদাস মূলতঃ কবি হলেও নাট্যসাহিত্যে তাঁর দক্ষতার গভীরতা ও ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের প্রেমভাবনার ক্রমপরিণতির স্তর এবং নাট্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখে মনে হয় যে, মহাকবি কালিদাসের নাট্য প্রতিভার বীজ মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ উপ্ত হয়েছে, বিক্রমোর্বশীয়-এ অঙ্কুরিত হয়েছে এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ পল্লবিত হয়ে পরিণত হয়েছে পুষ্পপর-সমৃদ্ধ বিশাল মহীরূহে।

আধুনিক কালে সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখিত প্রভাকর শংকর জোশী অন্যতম। তাঁর রচিত 'ভীমায়নম্' মহাকাব্য-এ সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষদের উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে যে ভেদাভেদ তা পরিস্ফুট হয়েছে। ভীমরাও নিম্নবর্ণের মানুষদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা পৌঁছেছেন যে- নিজেদেরকেই পদক্ষেপ নিয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে উচ্চবর্ণের সমকক্ষ হওয়ার জন্য। তিনি এমন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে জাতিবাদ, বর্গবাদ, উচ্চ-নীচ ভেদ থাকবে না, সকল মানুষ সমানাধিকার ও সম্মানের সাথে থাকতে

পারবে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দলিত সাহিত্যের প্রতীকরূপ 'ভীমায়নম্' কাব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণবাহী।

সংস্কৃত সাহিত্য সূচিত হয় বেদ রচনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে লৌহযুগীয় ভারতে রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ থেকে আদি মধ্যযুগ (মোটামুটি খ্রিষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী) পর্যন্ত চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে অবক্ষয় যুগ শুরু হওয়ার পূর্বেও একাদশ শতকে এই সাহিত্য আর একবার বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্তমান কালে সংস্কৃত পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা চলছে তার অঙ্গ হিসাবে ২০০২ সাল থেকে সর্বভারতীয় সংস্কৃত উৎসব চালু হয়েছে। যার লক্ষ্য সংস্কৃত সাহিত্যকে উৎসাহ দান করা।

হিন্দু ধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলি সবই সংস্কৃতে লেখা। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলিও হয় সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অথবা সংস্কৃত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই কারণে ভারতীয় সংস্কৃতিতেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। দাস, ড. দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নবম সংস্করণ ১৪১৭, কোলকাতা- ৭০০০০৬।

২। মুখোপাধ্যায় ড. গোপেন্দু : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত, দ্বিতীয় পরিমার্জিত প্রকাশ : ১ লা বৈশাখ, ১৪২৬, কলকাতা- ৭০০০৬৭

৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ : উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যলয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৭।

৪। স্বামী ভর্গানন্দ, পাতঞ্জল যোগদর্শন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সংস্করণ- মার্চ, ২০১৬

৫। স্বামী বাসুদেবানন্দ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উদ্বোধন কার্যলয়, কলকাতা, সংস্করণ : ২০১৬।

বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

সঞ্চিতা ভৌমিক
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কিছু আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। আর্যদের আগেও ভারতে ছিল আদিম অধিবাসী ও দ্রাবিড় জাতির বাস। প্রাচীন ভারতের জাতীয় চরিত্র আর্য-অনার্য উভয়ই বৈশিষ্ট্য দিয়ে রচিত হয়েছিল গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলে স্থায়ী বাসভূমি করে বৈদিক ভারতবাসী সুযোগ পেয়েছিল সে যুগের জ্ঞান সাধারণকে অনুশীলন করার। এরই ফলে গড়ে উঠেছিল বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শন সাহিত্য ইত্যাদি।

১। বৈদিক যুগের শিক্ষা :

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়কালকে বৈদিক যুগ হিসেবে ধরা হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে কয়টি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যেমন - বৈদিক যুগ, বেদ পরবর্তী যুগ এবং সূত্র সাহিত্যের যুগ।

২। বৈদিক যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য :

বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মনে করা হত তপস্যার মাধ্যমে পরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং ভক্তি ও ধর্মীয় ভাবের প্রেরণা সৃষ্টি করা প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মূলত ধর্মতত্ত্ব কে ভিত্তি করেই যাবতীয় শিক্ষাচিন্তা গড়ে উঠেছিল। আর জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে ছিল আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ ও মুক্তি।

৩। বৈদিক যুগের পাঠক্রম :

বৈদিক যুগের পাঠক্রম ছিল শুধুমাত্র বেদ অধ্যয়ন। বেদ এর আবৃত্তি ছিল একমাত্র শিক্ষা। নির্ভুল মাত্রা ও ছন্দের সাহায্যে বেদ অধ্যয়ন শেখানো হতো। বেদে সাত প্রকার ছন্দ প্রচলিত ছিল। শুধু আবৃত্তি নয়, এর সঙ্গে চিন্তা ও মননশীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। আবৃত্তিতে সঠিক উচ্চারণ এর উপর জোর দেওয়া হতো। বৈদিক মন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দ ও ভাষার উপলব্ধি ছিল বাধ্যতামূলক। তবে বৈদিক যুগের পাঠক্রমে শুধু যে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হতো তা নয়। সাধারণভাবে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ছন্দ, নিরুক্ত, ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪। বৈদিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতি :

শিক্ষাদানের প্রথম পর্যায়ে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করা হত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছাত্রদের সমষ্টিগত শ্রেণি থেকে পৃথক করে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। নিঃশব্দ ও নিঃসঙ্গ যোগ তপস্যার সাহায্যে আত্মার উন্নতি সাধন করতে হত। মানসিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে ছাত্রদের নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত। উচ্চ শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণ সঙ্গে যোগ দিত।

৫। বৈদিক যুগের শিক্ষক :

ছাত্র সম্পর্ক গুরু ও শিষ্য সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিকপূর্ণ। ছাত্র তাদের শিক্ষককে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন।

৬। বৈদিক যুগে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

বৈদিক যুগের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি ---

ক) বেদই ছিল শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু।
খ) বিষয়গত উন্নতি চেয়ে আত্মিক উন্নতি কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত।
গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।
ঘ) গুরুগৃহে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনকে সুদৃঢ় করা হত।
ঙ) ব্রহ্মচর্য ছিল বাধ্যতামূলক।
চ) শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।
ছ) শিক্ষকরা ছিলেন প্রজ্ঞাবান এবং ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত।
জ) ব্যক্তিগত শিক্ষা লাভের সুযোগ ও ব্যক্তিগত সুষম বিকাশের ব্যবস্থা করা হত।
ঝ) দর্শন, ব্যাকরণ, ধর্ম ও সংস্কৃতি, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি ছিল অধ্যায়নের বিষয়।
ঞ) সমাজে নারীদের মর্যাদা দান এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান।

৭) গুরুকুল :

বৈদিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বলতে গুরুকুল বা গুরুর আশ্রমকে বোঝাত। উপনয়নের পর শিক্ষার জন্য শিষ্যরা গুরুগৃহে সমবেত হত। এক একজন গুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত আবাসিক-আশ্রমিক-গৃহ-বিদ্যালয়। এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বলা হত গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা।

৪) উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম :

বৈদিক যুগের শিক্ষার গুরুরা উপনয়ন নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিষ্যকে ব্রহ্মচারী হিসেবে দ্বিতীয় জন্ম দিতেন। গুরুগৃহে থাকাকালে শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। কয়েকটি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলতে হতো এবং তার মধ্য দিয়ে শিষ্যের শিক্ষালাভ ঘটত।

৯) শিক্ষাকাল :

উপনয়নের মাধ্যমে বৈদিক শিক্ষা শুরু হত। ১২ বছরের শিক্ষাক্রমটি শেষ হত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

১০) সংরক্ষিত শিক্ষা :

বৈদিক যুগে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের শিক্ষাধিকার ছিল। শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। তাই বলা যায় বৈদিক শিক্ষা সর্বজনীন ছিল না।

১১) শিষ্যের দায়িত্ব :

গুরুগৃহে থাকাকালীন শিষ্যকে অনেকগুলি দায়িত্ব পালন করতে হত। যেমন - গুরুর সেবা করা, গুরুগৃহ পরিষ্কার করা, গো পালন করা, পূজার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা, গুরুর পরিবারের জন্য ভিক্ষা করার নির্দেশ পালন করা।

১২) গুরুকেন্দ্রিকতা :

বৈদিক শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক। গুরুর কথাই ছিল শেষ কথা। কোন প্রতিবাদের অবকাশ ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জি :

১) চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ : সাম্প্রতিককালে বাঙালিদের বেদ-গবেষণা এবং প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ, পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, সংস্করণ : বইমেলা, ২০০৬ (অক্ষয় তৃতীয়া ২০১১)

২) অধ্যাপক গোপ, যুধিষ্ঠির : বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো ২৮/১, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৬, সংস্করণ : আগস্ট ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ : ২০১২)

৩) ডক্টর বসু, যোগীরাজ : বেদের পরিচয় (বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস), ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা - ১২ : ১৯৫৭ প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০৩ (২০১২)

বৈদিক দেবতা

প্রিন্সি বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

ঋগ্বেদ মূলতঃ ভারতীয় আর্য জাতির প্রধান ধর্ম মূলক গ্রন্থ। এই সংহিতার কয়েকটি সূত্র বাদ দিলে অধিকাংশই প্রাকৃতিক শক্তির দেবী ভাবনায় সমৃদ্ধ, অপরূপ কল্পনার বিচিত্র প্রকাশ। অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ঐশী শক্তি রূপে কল্পনা করে তার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন বৈদিক ঋষিগণ ঋক্ সংহিতার মন্ত্রগুলি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- স্তুতি শ্রেণীর মন্ত্রে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, ধন, আয়, শক্তি, পুত্র ইত্যাদি। Winternitz সাহেব বলেছেন যে ঋক্বেদের স্রোতগুলিতে দেবতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ মেলে তাই এই স্তোত্রগুলি অত্যন্ত মূলবান। পৃথিবীর আদিম ধর্মগুলির উৎপত্তির ইতিহাস আমরা ঋক্বেদে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাই।

দেবতা তত্ত্বঃ আচার্য নাস্তার নিরুক্ত গ্রন্থে দেব এবং দেবতা শব্দ-দুটির একই অর্থ করেছেন- যারা ঐশ্বর্য দান করেন এবং আমাদের ঈপ্সিত বস্তুগুলি দান করেন। তেজোময় বলে যারা পদার্থগুলিকে প্রকাশিত করেন এবং যারা সাধারণত দেবলোকে অবস্থান করেন তারাই দেবতা। চার্যের বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে দেবতা তত্ত্ব সম্বন্ধ বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ঋক্বেদের স্তোত্রগুলিতে ধর্ম চিন্তা ভাবনার অনুসরণ করলে দেবতা তত্ত্বের এক বিবরণ রয়েছে। টিক্তক লিতে ধর্মীয় চিন্তাধারার অনুসরণ করলে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত এক বিবরণ রয়েছে। ঋক্বেদের স্মৃতিগুলোতে ধর্মীয় জীবন অনুসরণ করলে দেবতাতত্ত্বের এক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহু দেবতাতত্ত্ব অতিদেবতাবাদ এর মধ্যে দিয়ে দেবতা বাদ এর উত্তরণ ঘটেছে বৈদিক দেহতত্ত্বের।

প্রাকৃতিক রূপের মূর্তি রূপঃ ঋক্বেদের জ্বলিততের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, দেবতাই কোনও না কোন প্রাকৃতিক শক্তিতে জীবিত সত্তার আরোপিত মহিমাময় প্রকাশ। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা। যেমন--- প্রকৃতির জ্বলন্ত সূর্য, স্নিগ্ধ চন্দ্র, প্রজ্বলিত যজ্ঞের অগ্নি, বিদ্যুৎ, তারকাখচিত আকাশ রাত্রির আকাশ, হাস্যময় ঊষা, কল-কল্লোলিনী নদ-নদী, শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা প্রভৃতি। তেমনি আবার এই প্রকৃতির ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী রূপের প্রকাশে ভয় ও বিস্ময়ে হতবাক হতেন তারা। এই সমস্তই ঋষিদের মনে আনন্দ বিস্ময় ভয় ও বিহ্বলতার সঞ্চার করতো। এই সবেরই অভ্যন্তরালে অমোঘ দৈবশক্তির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ অনুভব করতেন ঋষিরা। ধীরে ধীরে নানা ঋক্মন্ত্রে এই “only gradually is a accomplished in the songs of the rig ved inself, the

transformation of these natural phenomena into mythological figures, in the gods and goddess"- এইভাবে সূর্য, সোম, মরুদ্গণ, বায়ু, ঊষা, পৃথিবী, পর্যন্ত, রাত্রি প্রভৃতি দেবতাদের নাম থেকেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে প্রাকৃতিক শক্তি ছিল তাদের উৎস। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপের ফলে এই সকল দেবতা। Winternitz বলেন, "So the songs of the Rigved a pro indisputably that the most prominent figures of myth have produced from personification of the most striking natural phenomena."

কিছু পৌরাণিক দেবতা আছেন যাদের নাম থেকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না যে তার কোনো প্রাকৃতিক পরিচয় কিছুটা বিরক্ত হলেও তাদের শক্তিমত্তা, অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা তাদের মূল পরিচয় আবিষ্কার করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর দেবতারা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অদিতি, বিষ্ণু, পবন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় রুদ্র ক্রমশ এরা দেবতার মূল হলেন সূর্য। অন্যান্য দেবতাগণ এই সূর্যেরই বিবৃতি মাত্র। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, হিরণ্যগর্ভ, ঐ সত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। বৈদিক ঋষিরা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সমস্ত দেবতাকে এই একই বিভিন্ন প্রকাশ রূপে তারা কল্পনা করেছেন। বহু ঈশ্বরবাদ ঋক্‌বেদের আপাত প্রতিতি মাত্র।

ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, অদিতি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রাকৃতিক শক্তির নির্দেশক তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এমনও যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। মতভেদ সত্ত্বেও বিখ্যাত Mythologist গণ একথা মেনে নিয়েছেন যে বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশই এসেছেন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে অর্থাৎ 'বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশই এসেছেন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে রূপেরই মূর্তি রূপ। "

ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে আবার কিছু দেবতা আছেন যারা মূর্তিবিহীন ভাব মাত্র। যেমন - শ্রদ্ধা, মনু প্রভৃতি দেবতা আছেন যারা ঋক্‌বেদে গুরুত্ব পেয়েছেন। এই সমস্ত দেবতাকে অনেকে "Lower Mythology" বলেছেন। যেমন ঋভু, অপ্সরা, প্রভৃতি। এরা যথাক্রমে ভূত, সমুদ্র, পর্বত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান এবং পবিত্র আত্মার স্বরূপ। বর্তমান যুগেও যে সকল এডমন্ড প্রস্তর বা একটি প্রাচীন বিক্রয় দেবতা হিসেবে পূজা করতে দেখা যায় তারও উৎস সুদূর বৈদিক যুগেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে ঋগ্বেদের দেবতা অর্থ বুঝি পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ বা দৃশ্য লোকের এমন সব প্রাকৃতিক বিষয়, যাদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাদের উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ মনের শিল্প শালায় দেবতা নির্মাণের এই সহজ-সরল অনাড়ম্বর পদ্ধতি আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর উক্তিটি প্রসঙ্গত

স্মরণীয়, "The process of God making in the factory of man's mind can not be seen so clearly only where else has in the Rigveda."

গ্রন্থপঞ্জী :

১) চক্রবর্তী শম্ভুনাথ; সাম্প্রতিককালে বাঙালিদের বেদ গবেষণা এবং প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ, (বৈদিক দেবতা) সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, ৩০ বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৬, বইমেলা, - ২০০৬ (অক্ষয় তৃতীয়া- ২০১১)

২) বসু ড. যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা - ১২, ১৯৫৭ প্রথম সংস্করণ আগস্ট - ২০০৩ (২০১২)

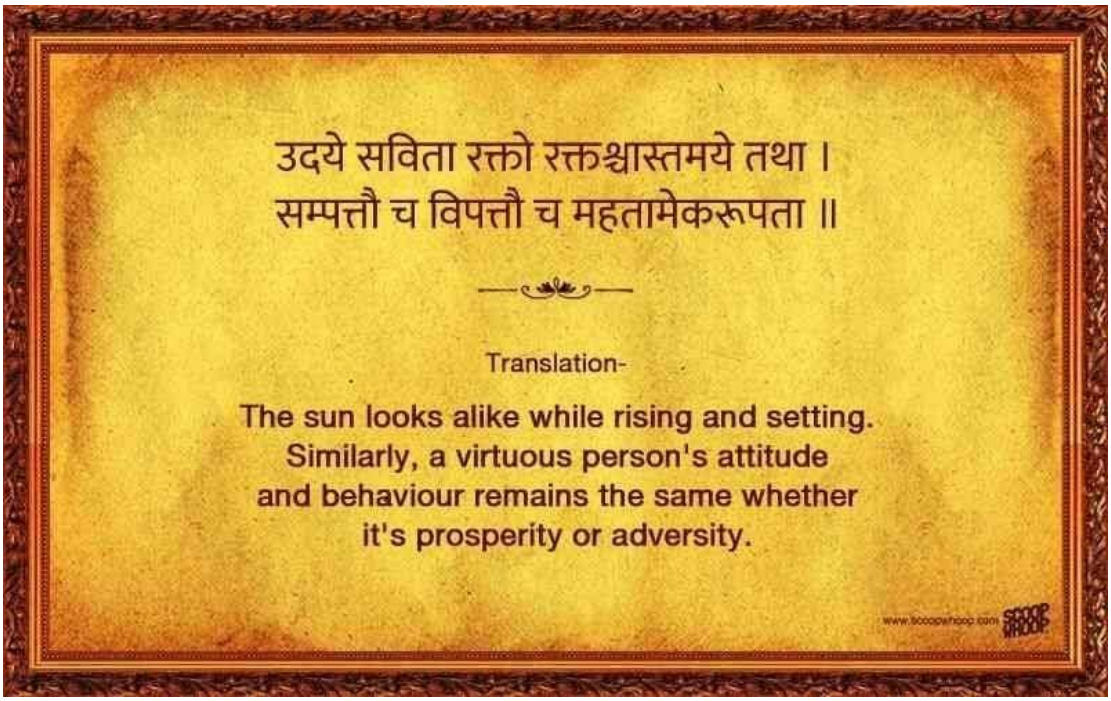

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কালিদাসের "প্রকৃতি-চেতনা"

নেহা মন্ডল

সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী

প্রকৃতি ও জীবজগৎ একই বিশ্ববিবর্তনের দুটি বিচিত্র প্রকাশ। মানবসমাজকে নিয়ে এই জীবজগৎ। এই কারণে বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্য সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। যুগে যুগে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কাব্য কল্পনায় এই সম্বন্ধটি ধরা পড়েছে। ইংরাজ কবিদের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রকৃতিকে সচেতন জীবরূপে দেখার জন্য Wordsworth 'Poet of Nature' বা 'প্রকৃতির কবি' আখ্যা পেয়েছেন, সেইরূপ একই কারণে ভারতবর্ষেও কালিদাসকে 'প্রকৃতির কবি' রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

স্বাভাবিকভাবে অমর কবি কালিদাসের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ও অনবদ্য নিসর্গপ্রেমের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেও নিসর্গপ্রীতির অনুপম নিদর্শন বহুল পরিমানে বিদ্যমান।

নাটকের প্রথমাঙ্ক আরম্ভ হয়েছে গভীর অরণ্যে রাজা দুষ্যন্তের মৃগয়া দৃশ্যের সঙ্গে। রাজা রথে বসে মৃগের পশ্চাৎ ধাবন করেছেন। হরিণটি ও শরপতনের আশঙ্কা করে দ্রুত লাফ দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এখানে কবি 'যদা লোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা...। ' কিংবা 'গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ' ইত্যাদি শ্লোক দুটিতে অনুপম মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির গতিশীল দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন।

কণ্ব তপোবনে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শান্ত তপোবনের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। আশ্রমের চারপাশে বড় বড় গাছ, গাছের নীচে নীবার ধান্য, গাছের কোটরে শুকপাখীদের নীড় বা তপোবনের পরিবেশে আজন্ম লালিত হরিণগুলির নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান - অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

প্রথমেই তপোবনপালিত শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে জলসিঞ্চন করতে দেখা যায়। পবনে আন্দোলিত কেশর বৃক্ষের পাতাকে দেখে শকুন্তলা প্রিয়জনের আহ্বান বলে মনে করেন। সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শকুন্তলার অনুরাগ গভীর। তাই তিনি নবমল্লিকার নাম দেন বনজ্যোৎস্না। তাছাড়া গাছে জল দেওয়া কেবল কর্তব্য পালনের তাগিদেই নয়, সেগুলির প্রতি শকুন্তলার স্নেহ বিদ্যমান। ---

'ন কেবলং তাতনিয়োগ এব।

অস্তি মে সোদরস্নেহোঽপি এতেষু। '

একটি ভ্রমর শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলনের ব্যবস্থা করেছে। কারণ এই ভ্রমরের হাত থেকেই বাঁচানোর জন্য রাজার আবির্ভাব।

দ্বিতীয়াঙ্কে আশ্রমের বাইরে রাজা যেখানে শিবির স্থাপন করেছেন সেখানেও একটি বৃক্ষছায়াশীতল শিলাসন আছে, এর দ্বারা রাজার মনও স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরে উঠবে --- এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় --- 'সাম্প্রতম্ এতস্মিন্ পাদচ্ছায়াবিরচিতবিতানসনাথে শিলাতলে নিহীদতু ভবান্'।

তৃতীয়াঙ্কে বেতসবনের দৃঢ়রক্ষণে স্থিত লতাকুঞ্জের স্নিগ্ধ শীতল মৃণাল সম্মাচ্ছিত শিলাতলে অনুরাগ পীড়িতা শকুন্তলাকে শায়িত রাখা হয়েছে। প্রিয় সখীর শরীরসন্তাপ দূর করার জন্য অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা জলসিক্ত পদ্মপত্রের দ্বারা তাকে বীজন করেছে। শকুন্তলার মনোগত অভিপ্রায় জানানোর জন্য পদ্মপত্রের উপর নখ দিয়ে প্রণয়পত্র রচিত হয়েছে---

'তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি...। '

তারপর দুষ্যন্ত লতাকুঞ্জের প্রেয়সীর সাথে মিলিত হয়ে তাকে আনন্দ দান করেছেন। কবি কল্পনা সমৃদ্ধ প্রকৃতির এরূপ রমণীয় পরিবেশে নায়ক-নায়িকার মিলন খুব কম কবিই ঘটিয়েছেন।

চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলাতে প্রকৃতির এবং প্রভৃতিতে শকুন্তলার যে প্রগাঢ় স্নেহ অনুরাগ ছিল তা যেন পতিগৃহে যাত্রার উদ্দেশ্যে তপোবন থেকে কণ্বদুহিতার বিদায় গ্রহণকালে কবির লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে শকুন্তলা আভরণ প্রিয়া হলে ও গাছ থেকে পাতা ফুল ছিঁড়তো না, সেই শকুন্তলা প্রস্থানকালে কণ্ব তরুলতা ও পশুপাখির কাছে অনুজ্ঞা চেয়েছেন ---

'অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং

বনবাসবন্ধুভিঃ।'

শকুন্তলার বিরহশোকে সমগ্র তপোবন ব্যাকুল। ময়ূর নৃত্য বন্ধ করেছে। মৃগের মুখ থেকে অর্ধচর্বিত ঘাস মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। বৃক্ষ থেকে শীরফণ পাতা ঝরে পড়েছে। মৃগশাবক শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরে টেনেছে। এর দ্বারা তরুলতা, পশুপক্ষী সবকিছুর সঙ্গে মানব সমাজের অন্তর্গূঢ় যোগসূত্রটি অভিব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চমাঙ্কে তপোবনবাসী বল্কলধারী দুই কণ্ব শিষ্যের মধ্যে শকুন্তলাকে দুটি বিশুদ্ধ পাত্রের মধ্যবর্তী নবোদম্পত কিশলয়ের মত দেখাচ্ছিল ---

'মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রানাম্'।

মধুপান করতে ইচ্ছা থাকায় ভ্রমর হিমগর্ভ কুন্দ কুসুমের ভিতরে বসতেও পারে না, আবার ত্যাগ করে যেতেও পারে না। ঠিক সেইরকম শাপপ্রভাবে বিস্মৃত চিত্ত রাজও শকুন্তলাকে অন্তর্বর্তী দেখে গ্রহণ ও করতে পারলেন না, আবার ত্যাগ করতেও পারলেন না। বস্তুতঃ পঞ্চমাঙ্কে হস্তিনাপুরের কৃত্রিম নাগরিকতার পরিবেশ থাকলেও তরুপুষ্প পক্ষীর নাম সন্নিবেশিত করে কবি কালিদাস রমণীয় প্রাকৃতিক উপস্থিতির সামঞ্জস্য দেখিয়েছে।

ষষ্ঠাঙ্কে প্রমোদবনে বসন্ত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিন্তু প্রেয়সীকে প্রত্যাখ্যানজনিত অনুতাপে ক্লিষ্ট রাজার চিত্তে, বসন্ত প্রকৃতির আনন্দ বিকাশ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে --

‘চূতানাং চিরনির্গতাপি কালিকা
বধ্নাতি ন স্বং রজঃ।’

যেমন -- আম্রমুকুল প্রস্ফুটিত হলেও তাতে পরাগের প্রকাশ নেই। কুরবক কুসুম মুকুলের অবস্থাতেই রয়ে গেছে। শীত চলে গেলেও কোকিলের কণ্ঠে কুহুস্বর সম্পূর্ণ ধ্বনিত হচ্ছে না। অর্থাৎ বসন্তের প্রণয়ানুরাগ যেন থেমে গেছে।

সপ্তমাঙ্কে দুষ্যন্ত মেঘের স্তরের মধ্যে দিয়ে স্বর্গ থেকে ফিরেছেন। পথে মরীচের আশ্রম মন্দার বৃক্ষের শ্রেণী, অশোক তরু প্রভৃতির অপূর্ব স্বর্গীয় শোভা ও প্রশান্তির নিদর্শন বিরাজিত। এর ফলে দুষ্যন্ত শকুন্তলার স্নিগ্ধ মিলনপর্ব সূচিত হয়েছে।

প্রতিটি অঙ্কেই প্রকৃতিপ্রিয় কবিলতাপাতা ও ফুলের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নাটকীয় আখ্যানের সূত্রটিকে পরিচালিত করে নাটকটিকে এক সুন্দর মালার আকারে সাজিয়েছেন। প্রকৃতির বহু বিচিত্র সত্তার মধ্যে এই মিলন সূত্রটির রয়েছে বলেই একটির দুঃখ শোকে অপরটি সমব্যথী হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে নিসর্গের এই যোগসূত্রটি কবি ভাবনায় ধরা পড়েছে বলেই অজস্র প্রকার প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে মনুষ্য ঘটনা বহুল নাটকীয় আখ্যানের পৌর্বাপর্বটি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিপ্রেমিক মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে তাকে দিয়ে নাটকের এত কার্যসাধন করিয়েছেন এবং মানবের সাথে প্রকৃতির এমন এক আত্মিক সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়

গ্রন্থপঞ্জী :

১। অভিজ্ঞান শকুন্তলা, নির্মাল্য দাস
২। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ড. অনিল বসু

বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থা

অনামিকা বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

দেবতাদের স্তব ও তাদের কাছে জাগতিক প্রার্থনাই বেদের সংহিতা অংশের মূল বিষয়। নানা সংহিতার প্রার্থনার বস্তু প্রায় একইরকম হয় - যুদ্ধময়, শত্রুনিধন, পশুধন, স্বর্ণ, স্বাস্থ্য, সন্তান, রোগমুক্তি এবং দীর্ঘ আয়ু। যেমন ইন্দ্রসুপ্তে - যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো... স জনাসো ইন্দ্রঃ- যাকে ছাড়া যুদ্ধজয় সম্ভব নয়, তিনিই ইন্দ্র। লাঙ্গলের ফালা জমি কর্ষণ করুক বাহকরা বলদের সঙ্গে গমন করুক ফালা বিকৃষন্তু ভূমং শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ। অগ্নিসূক্তে ৪ নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে

- সবোধি সুরিমঘবা / বাসুপতে বসুদাবন্ যুযোধ্য স্মদ্বেষাংসি।।

- হে ধনপতি, ধনদাতা তুমি জাগো। তুমি বিদ্বান, অন্নবান, আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর।

যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি দাস বর্ণকে নিকৃষ্ট গুহায় পাঠিয়েছেন, যিনি লক্ষজয় করে ব্যাধের মত শত্রুর সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করেন, তিনি ইন্দ্র। যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি / যোদাসংবর্ণধরং গুহাকঃ। শ্বঘ্নীব যো জিগীবাঁল্ল ক্ষমাদ / দমঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ। বৈদিক সংহিতায় বহু বহু দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। যেমন অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, সবিতা, অদিতি, যম, সোম, বিষ্ণু, উষা, পূষণ, পর্জন্য, সরস্বতী প্রভৃতি। তবে শৌর্য, বীর্য, শত্রুনিধন, লুণ্ঠন, শত্রুসম্পদ অপহরণ, প্রভৃতি গুণগরিমায় ঋগ্বেদে ইন্দ্রের গৌরব সর্বাধিক। তারপরেই আছে অগ্নি। সর্বাধিক সূক্ত রচিত হয়েছে এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে। ইন্দ্র স্তুত হচ্ছেন ২৫০ টি সূক্তে ও অগ্নি ২০০ টি সূক্তে। এরপরের স্থান সোমের, যিনি ১১৪ টি সূক্তে স্তুতি পায়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দুই বৈদ্যদেবতা রোগীকে। বিপন্নকে জলমগ্ন বা অগ্নিবেষ্টিত ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করেন। উষা সুন্দরী, চিরতরুণী। বরুণ বিচারক, দিবারাত্র মানুষের দিকে তার দৃষ্টি। পাপীকে দন্ড দেবার জন্য 'যম' মৃত আত্মাদের নিজলোকে আপ্যায়ন করেন। প্রায়ই দেখা যায় শতায়ু হওয়ার প্রার্থনা। দীর্ঘকাল যেন সূর্যোদয় দেখতে পাই 'জ্যোক পশ্যেম সূর্যমুচ্চুন্তম্'। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্। '

স্তব ও প্রার্থনা ছাড়া সংহিতাভাগে এক চতুর্থাংশে দেখা যায় কিছু অন্য ধরনের সুপ্ত। যেমন সংবাদ সুক্ত অর্থাৎ দুই বা তার বেশী ব্যক্তির সংলাপক। এইসব সুক্তগুলির যজ্ঞে কোনো উপযোগিতা নেই। আর আছে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মা বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা - কাল, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, দেবী, বৃহস্পতি, পুরুষ ও সৃষ্টির উপাদান দার্শনিক সুক্তগুলি। বেদের উপনিষদে যে জ্ঞান কাণ্ডের বিকাশ হয় তার বীজ এই

সুক্তগুলির মাঝখানে নিহিত। যেমন প্রজাপতি সুক্তে প্রজাপতিকে অদ্বিতীয় অধিশ্বর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষ সুক্তে বিরাট পুরুষের কল্পনা - 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষো সহস্রপাঃ।' দেবী সূক্তে অম্ভৃণ ঋষির কন্যাবাক্ নিজেকেই পরমাত্মারূপে ঘোষণা করেন এবং নিজের স্তুতি করেছেন। তিনি নিজেকে অন্য সব দেবতা রূপে স্তুতি করেছেন। তিনি ভুবনের সৃষ্টি কারিনী। অনেকের মতে শব্দ ব্রহ্মবাদের উৎপত্তি এখান থেকেই। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে দার্শনিক জিজ্ঞাসা দেখি - 'কো অদ্ধা বেদ ক হ প্রবচৎ কুত অজাতা ইয়ং বিসৃষ্টঃ'- এই সৃষ্টি কোথা থেকে হল কে তা বলতে পারে? 'আপ্রীসূক্তে' অগ্নিকে বিভিন্ন নামে স্তুতি করা হচ্ছে। প্রায় ২০টি সংলাপ সূক্তে পণ্ডিতেরা পরবর্তী মহাকাব্যে ও নাটক কাব্যের আদি উৎস বলে চিহ্নিত করেন। অনেক মন্ত্র আছে যে গুলি দানস্তুতি বা ধনদাতার প্রশংসা সূচক ঋগ্বেদের সূক্তে এরকম ৭ টি ঋক্ আছে। এছাড়া মন্ত্রে ত্রিবৃষ্ণর পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি আনাকে শকটযুক্তা গোদ্বয় ও দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করে খ্যাতি লাভ করে। যারা দেবতাদের পরিতৃপ্ত করেন। দান করেন, তাদের অভিলাস পূর্ণ হয়। তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের আগে থাকেন। অমরত্ব লাভ করেন, দরিদ্র্য, ক্লেশ, যোগ, শক ব্যথা বেদনা ভোগ করেন না... দেবতাগণ তাদের রক্ষা করেন। তাদের যুদ্ধে জয়ী করেন। নয়টি মন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। এখানে ঋষি ভিক্ষু, দান দেবতা। এখানে বলা হচ্ছে কোনো ক্ষুধার্ত অন্ন ভিক্ষা করলে কোনো অন্নবান যদি তা অগ্রাহ্য করে তাহলে সে কখনোই সুখী হয় না। যে দেবতাকে দেয়না। মানুষকে দেয় না, শুধু নিজই ভোজন করে সে শুধু পাপই ভক্ষণ করে। -- 'কেবল ঘো ভবতি কেবলাদী'।

'সূর্যাসূক্তে'-বিবাহের আচার অনুষ্ঠান বর্ণিত আছে। সূর্যকন্যা সূর্যার সঙ্গে সোমের বিবাহ। বধুকে বলা হচ্ছে 'শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবরের কাছে সম্রাজ্ঞী হও। জীবনে মরণে পতির সঙ্গী হও। হে কল্যাণী, মন সুন্দর রাখ, রূপে উজ্জ্বল হও, মানুষকে শান্তি দিও, পশুদেরও।

'অক্ষসূক্তে'- জুয়াড়ির আত্মগ্লানি ও অনুতাপ বর্ণিত আছে। বৃদ্ধ অশ্ব যেমন কেউ মূল্য দিয়ে কেননা তেমন জুয়াড়িকে কেউ সমাদর করেনা। তার স্ত্রীকে অন্যে নিয়ে গেছে, পিতামাতা তাকে অস্বীকার করেছে, সে কর্পদকহীন, নিশাচর।

'মন্ডুকসূক্তে'- ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে ব্রহ্মচারীদের বেদ পাঠধ্বনির উপমা দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ যেমন আচার্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে বেদধ্বনি করে, তেমন মেঘ ডাকলেই ব্যাঙেরা ডাকতে শুরু করে। যজ্ঞে এই সূক্তের প্রয়োগ নেই। ছয় ঋক্ সমন্বিত অরণ্যানী সূক্তে দুর্ভেদ্য অরণ্য চিত্র দেখা যায়। সূক্তটিতে গীতিকবিতার সুর পাওয়া যায়।

খাদ্য হিসাবে বৈদিক যুগে অন্ন, যব, ফল-মূল, শাক-সব্জী, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে সোমরস ও মাংসের কথাও পাওয়া যায়। অন্নের স্তব। বিশেষত সোমরস ও মাংস ইন্দ্রের খুবই প্রিয় খাদ্য ছিল বলে জানা

যায়। ইন্দ্রের উক্তি - বৃষাকপিক বাড়ির আমার জন্য। ১৫-২০ টা ষাঁড়ের মাংস রাঁধা হচ্ছে, তাই খাব আর সোমরসে উদর পূর্তি করব উক্ষো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্। ইতামদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণনিং মে। সোমের নেশার অপূর্ব বর্ণনা নবম মন্ডলে। 'সত্র' হল ১২ বছর ব্যাপী সোমযাগ। আরও দীর্ঘ সোম-যাগেরও উল্লেখ আছে। সোম পানের তৃপ্তিতে ইন্দ্র দাড়ি নাড়ছেন। ইন্দ্রমূর্ত্তির কেনাবেচা চলছে। কে দশটা গরু দিয়ে এই ইন্দ্রমূর্তি কিনবে'। বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় দেখা যাচ্ছে, সমাজে ইন্দ্রের প্রাধান্যও।

বৈদিক যুগে নারী সমাজ :

বৈদিক মন্ত্রগুলিতে বৈদিক সমাজের যে নিয়ম নীতির পরিচয় আছে, তা সরাসরি কোথাও উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু দেবতা-স্তুতির মধ্যে আভাসে ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। বিশেষতঃ সেখানে ব্যবহৃত উপমাগুলি এ কাজে খুবই সহায়ক। সুতরাং সে সমাজে নারীর অবস্থা কেমন জায়গায় ছিল, সেটা জানতে বৈদিক মন্ত্রের দিকে লক্ষ্য দিতে হয়। এবং তা থেকে যে সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, নারীরা প্রধানতঃ সুরক্ষিতা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারে পুরুষ প্রধান হলেও দেখা যাচ্ছে গৃহে গৃহিণীই কর্ত্রী ছিলেন - সদ্যবিবাহিতার প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, দেবর, ননদ সকলের সাম্রাজ্ঞী হয়ো। বিবাহিতা গৃহস্থ জীবনই ছিল আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষিত- 'যতক্ষণ সে বধুলাভ না করে ও সন্তান না আসে ততক্ষণ পুরুষ অসম্পূর্ণ'। সুন্দর দাম্পত্য ছিল - 'ঘৃতধারা সোমের দিকে ধাবিত হচ্ছে যেমন করে অলংকৃতা সজ্জিতা তরুণী স্বামীর কাছে যায়। তেমন পবিত্র, যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিত বধূ। আবার 'হে ভগদেব ঃ স্ত্রী যেমন প্রিয় স্বামীতে আনন্দ পায় তুমিয়ো তেমন আমাতে সুখী হও'। স্বামী নির্বাচনে নারীর স্বাধীনতা ছিল স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জানে চিৎ'। স্বয়ম্বরও ছিল। নারী হরণ হত- পুরুমিত্রের কন্যাকে বিমদ হরণ করেছেন। অবিবাহিতা কুমারী নারীদের কথাও পাওয়া যায় কিছু শব্দের ব্যবহার দেখে, কেমন আমাজু, অমাজুরা, কশপা, বৃদ্ধকুমারী, জরৎকুমারী।

পুরুষের বহুবিবাহের প্রথা প্রচলন ছিল। সপত্নীনাশনের মন্ত্রগুলি এর প্রমাণ দেয়। বিধবা রমণীর বিবাহের অধিকার ছিল। সহমরণের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। সে যুগে সতীত্বের বিশেষ মর্যাদা ছিল। সমাজে ব্যাভিচারের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।

অপত্নীক পুরুষের যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার অধিকার ছিল না। - 'ন বৈ অপত্নীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহ্নন্তি' রামায়ণে আমরা দেখি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য রামকে স্বর্ণসীতা তৈরি করতে হয়েছিল।

স্ত্রী ছিলেন যজ্ঞের অর্ধাংশ - 'অর্ধো হ বা এষ যজ্ঞস্য যৎপত্নী'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পণ্ডিতকন্যা লাভের জন্য আচার অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্বিধায় তার ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানলাভে স্ত্রীপুরুষভেদ ছিল না।

সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য। সেখানে থেকে সেই সমাজ সম্পর্কে ধারণালাভ প্রচুর গবেষণাসাপেক্ষ। সুতরাং সেই সমাজ সম্পর্কে যা বলা হল, তা অন্ধের হস্তীদর্শনের মত সামান্য দিক দর্শন বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। বসু, যোগীরাজ : বেদের পরিচয়, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬২।

২। গোপ, যুধিষ্ঠির : বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ : আগষ্ট (২০০৩)

৩। ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী : ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৬০ (প্রকাশকাল)

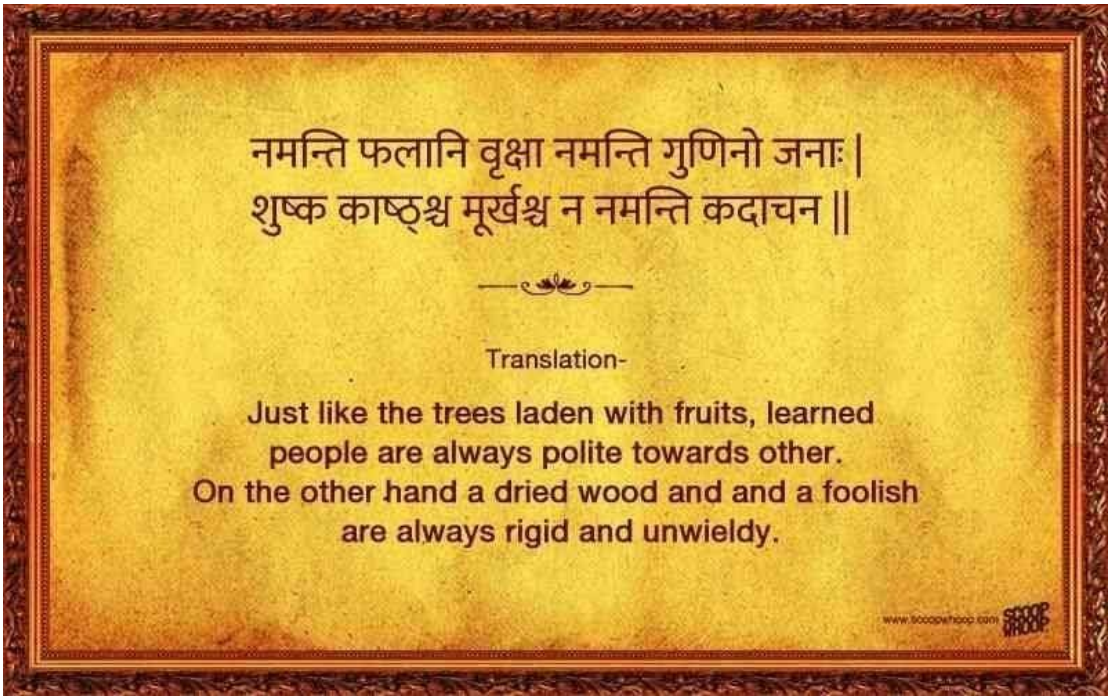

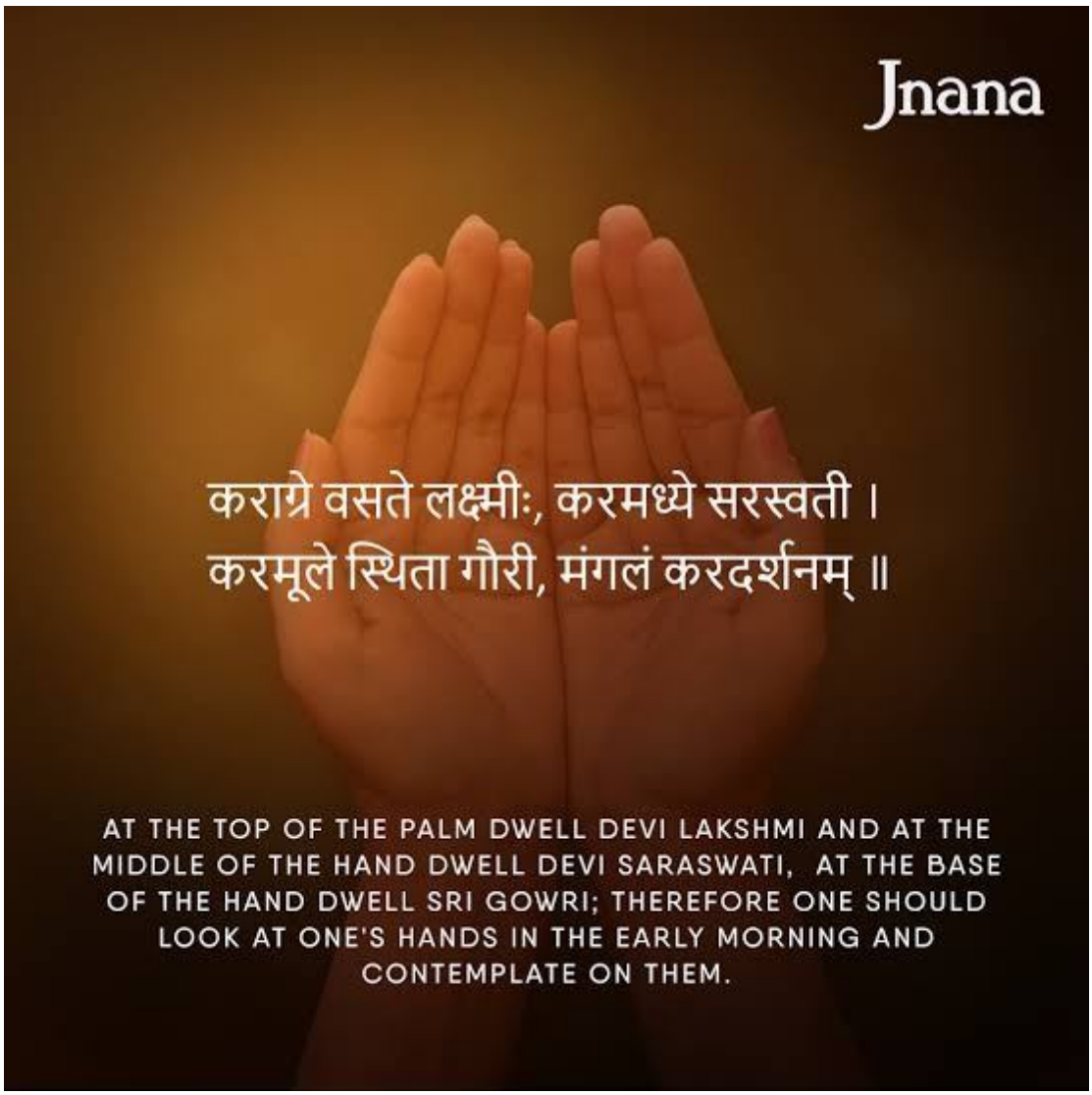
Jnana
कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती ।
करमूले स्थिता गौरी, मंगलं करदर्शनम् ॥
AT THE TOP OF THE PALM DWELL DEVI LAKSHMI AND AT THE MIDDLE OF THE HAND DWELL DEVI SARASWATI, AT THE BASE OF THE HAND DWELL SRI GOWRI; THEREFORE ONE SHOULD LOOK AT ONE'S HANDS IN THE EARLY MORNING AND CONTEMPLATE ON THEM.

বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

দেবাঙ্গনা দাস
সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে মোটামুটি ৩টি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে ভারতের শিক্ষা মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা এবং আধুনিক যুগে ভারতের শিক্ষা। ইতিহাস অখন্ড অবিভাজ্য। শিক্ষার ইতিহাস ও তাই। আধুনিক ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার উৎস তবু খুঁজতে হবে প্রাচীন ভারতেই।

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি যুগে ভাগ করি। কেউ কেউ শিক্ষার ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং আধুনিক যুগ হিসাবে ভাগ করেন। এরূপে ভাগ করা ঠিক নয়। কারণ হিন্দুযুগে কেবলমাত্র হিন্দু শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না, বৌদ্ধ ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও শিক্ষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ও একসময়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছিল। তেমনি মুসলমান যুগে মুসলমানী শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না, হিন্দু শিক্ষাও প্রচলিত শিক্ষা ছিল না, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দেশীয় শিক্ষাও প্রচলিত ছিল। অতএব হিন্দু শিক্ষা, মুসলমান শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে ভাগ না করাই বাঞ্ছনীয়। এরূপ ভাগ করলে শিক্ষার ইতিহাসকে বিকৃতই করা হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সভ্যতা সমন্বয়ধর্মী আর্য ঋষি নিজেকে ক্ষুদ্রগন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বমানবকে বলেছেন - "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এই উপলব্ধি থেকেই সমন্বয়ের মনোভাবের জন্ম নিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। আর্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে পরমাত্মা অবিনশ্বর হলেও জীবাত্মা নশ্বর। তখন শিক্ষা ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। আর্য ঋষিরা মনে করতেন যে, আত্ম-জ্ঞান ও আত্মপলব্ধি-ই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। 'আত্মনাং বিদ্ধি' নিজেকে জানবার মধ্য দিয়েই সত্যোপলব্ধির সাধনা আর্যঋষিরা করে গিয়েছেন। হিন্দু দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ। জ্ঞানার্জনের শেষ নেই। শিক্ষার শেষ নেই-- "যাবজ্জীবন অধীতে বিপ্রঃ" পরম ব্রহ্মাকে জানবার অতীন্দ্রীয় বাসনা থেকেই ভারতীয় আর্য ঋষিরা একসময় বলেছিলেন - "ভূমৈব সুখ্যং, নাল্পে সুখমস্তি" বিদ্যাই মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। "সা বিদ্যা যা বিমুক্ত যে। " আর্য ঋষিরা জাগতিক সুখকে জীবনের চরম বলে মনে করেননি-

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। "জ্ঞান অর্জন করবার পরিবর্তে চরিত্র গঠন ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও আত্মোপলব্ধি ছিল প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আদর্শ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শেষ কথা ছিল আত্মার মুক্তি। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে দিয়েই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বিকশিত হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যা ও অধ্যাত্ম বিদ্যা-ই পরাবিদ্যা; আর যাবতীয় শিল্প-বিজ্ঞান-কলা ইত্যাদি লৌকিক বিদ্যা হল অপরাবিদ্যা। ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা চেয়েছিল দুই ধরনের শিক্ষার যুগপৎ বিকাশ ঘটাতে। পরাবিদ্যা শিক্ষার শেষ কথা হলেও অপরাবিদ্যা ব্রাহ্মাণ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল।

বিদ্যারম্ভ, ব্রাহ্মচর্য ও আচার্য :

বর্তমান যুগে 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের মত তখন নবীন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা 'বিদ্যারম্ভ' ও 'অক্ষরক স্বীকরণ' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হল। পাঁচ বছর বয়স্কে চৌল কর্ম ও চূড়াকর্মের মধ্যে দিয়েপ্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হত। প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের মধ্যে পিতার তত্ত্বাবোধনে-ই সম্ভব হত। পিতা-ই পুত্রকে বেদ শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার শিক্ষা গ্রহণ করত। শূদ্রের বেদ শিক্ষা অধিকার ছিল না; পরে শিক্ষা জটিল হলে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গুরুকূল ও আচার্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ভারতের তপোবন হচ্ছে আদি বিদ্যালয় ও আর্য ঋষিরা হচ্ছেন আদি গুরুকূল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার তপোবনের গুরুই (আশ্রম) ছিল শিক্ষার্থীর পুণ্যতীর্থ। উপনয়ন ব্রাহ্মাণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রাচীন সংস্কার উপনয়নের অর্থ হচ্ছে - সমীপে নিয়ে যাওয়া। পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর উপনয়নের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গমন করত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১২ বছর বয়সে উপনয়ন হত। পরে এই বয়সকালে আরো বেড়ে যায়। গুরুগৃহে-ই থাকতে হত। শিক্ষার্থীকে নানাভাবে পরীক্ষা করে উপযুক্ত বিবেচিত হলে তবেই গুরু তাকে শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা তাই ব্রহ্মাচর্যাশ্রম বলে খ্যাত। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মাণ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরু বা আচার্য ছিল পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি শিক্ষার্থীদের পারমার্থিক পিতা হিসাবে সম্মান পেতেন। সে যুগে গুরুর সাহায্য ছাড়া বেদ শিক্ষা সম্ভব ছিল না। আচার্য ছিলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি পক্ষপাত শূণ্য সমদৃষ্টি নিয়েয়াচার্য সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাদান করতেন। আচার্যের শিক্ষাদানকে জীবনের মহত্তম বৃত্তি বলে মনে করতেন। ত্যাগ চরিত্র, জ্ঞান ও ধর্মে ঐকান্তিকতার জন্য সমাজে আচার্য সর্বাধিক পূজ্য ছিলেন। শিক্ষার গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুরুশিষ্যকে সর্বাধিক কর্মই উপদেশ দিতেন গুরুগৃহে শিষ্য সেই পরিবারের একজন হয়েই বসবাস করত। গুরু শিষ্যের আহারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে গুরু শিক্ষাদান করতেন। পারিশ্রমিক ছাড়াই তিনি বিদ্যাদান করবেন।

আশ্রমে বৈদিক শিক্ষা :

প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহ বা আশ্রমকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার এই আশ্রমিক রূপের মধ্যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আশ্রমে শিক্ষার্থীরা গুরুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর উন্নত চিন্তাধারায় নিজেদের সমৃদ্ধ করত। শিষ্যদের গুরুগৃহে অনেক রকম কাজকর্ম করতে হত। গোপালন, ভিক্ষা সংগ্রহ, গৃহের কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা লাভ করত। ফলে স্বাবলম্বন, কর্মদক্ষতা, শ্রমের মর্যাদা মনুষ্যত্ববোধ, আত্মত্যাগ, সেবামূলক মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হত। আশ্রমের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আত্মবিকাশের অনুকূল ছিল। গৃহ পরিবেশ থেকে দূরে, প্রকৃতির নির্জন পরিবেশ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আশ্রমিক ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক। শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা তাদের সাধ্যানুসারে গুরুদক্ষিণা দিত। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষা করে আশ্রমের খরচ চালাতেন। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের ভিক্ষা দিতেন।

বৈদিক শিক্ষায় ব্যাপক পাঠক্রম ছিল না। পরে পাঠক্রমের মধ্যে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ্য যুগে বর্ণভেদে শিক্ষার তারতম্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষা পাঠক্রমে স্থান পায়। ৪ টি বেদ (ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব) ৬ টি বেদাঙ্গ (ছন্দ, ব্যাকরণ, শিক্ষা অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞান, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষশাস্ত্র) উপনিষদ্, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ পাঠক্রমের অন্তর্গত ছিল। ব্রাহ্মণদের আচরণবিধি পালনের জন্য সূত্র ও দার্শনিক জ্ঞানের জন্য বেদান্ত ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পাঠক্রমের মধ্যে ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, অস্ত্রবিদ্যা, রাশি (গণিত), ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, একায়ন (নীতিশাস্ত্র), ব্রহ্মবিদ্যা, বাক্যবাক্য (তর্কশাস্ত্র) ইত্যাদি বিষয়ও স্থান পেয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় মৌখিক পদ্ধতি সর্বাধিক স্থান পেয়েছিল। তবে গুরু অনেক সময় শিষ্যের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষাদান করতেন। বেদ শিক্ষা গ্রহণে অনেক সময় লাগত। সাধারণত শ্রাবণ পূর্ণিমাতে শিক্ষারম্ভ হত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ঝড়-বৃষ্টি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কারণে শিক্ষাদান বন্ধ থাকত। গুরু শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলেও শিক্ষায় শাস্তি দানের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীদের ভয় দেখিয়ে, খেতে না দিয়ে, ঠান্ডা জলে স্নান করতে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত - দৈহিক শাস্তি দানের ব্যবস্থা ছিল না। চরম অবস্থার মধ্যে গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হত। প্রতি বছর ৪১/২ থেকে ৬ মাস শিক্ষা দান চলত। পরে এই সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রাধান্য থাকলেও গুরু সমষ্টিগত শিক্ষাও দিতেন। গুরুর মৌখিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত। গুরু মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুক্তি ও বিচার স্থান

পেত। গুরু ব্যখ্যা করে বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। শিক্ষা পদ্ধতিতে স্মৃতি ও মেধাশক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে শিক্ষাদান হত।

শ্রবণ : গুরু মা বলেন তা মন দিয়ে শোনা।

মনন : গভীর ভাবে চিন্তা করা।

নিদিধ্যাসন : একাগ্রভাবে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করা।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা যুক্তি নির্ভর হওয়ায় শিক্ষায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অনেক সময় গুরু সম্বোধনে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষায় পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে শিক্ষার্থীদের অধীত বিদ্যার পরীক্ষা হত। সমাবর্তন উৎসবের মধ্যে শিক্ষার্থী তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গুরুগৃহ থেকে বিদায় নিত। গুরু সমাবর্তন উৎসবে শিক্ষার্থীকে কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ দিতেন - সেই উপদেশগুলি ও অধীতবিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থী বৃহত্তর জীবনে কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করত।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কঠোর আচরণ বিধি মেনে চলতে হত। কঠোর বিধিনিষেধ ও কৃচ্ছসাধনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আশ্রমিক জীবন গড়ে উঠত। আশ্রমে শিক্ষার্থীদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। মাদক দ্রব্য, বিলাস-সামগ্রী, বেশভূষা, অট্টহাসি, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, গুরুর সামনে বসা ও চলাফেরা করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আশ্রমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীরা তাঁর পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করত এবং বিভিন্ন সময় ভিক্ষা করে কাঠ কেটে এনে ও অন্যান্য কাজকর্ম করে গুরুর পরিবারকে সাহায্য করত।

বৈদিক যুগে নারী শিক্ষা :

বৈদিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। তাঁরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন, যাগযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করার অধিকারীও ছিলেন। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করতে পারতেন ২০০ খ্রি: পূর্বের আগে উপনয়ন মেয়েদের ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত ছিল। এর নমুনা আমরা পাই বাণভট্টের লেখা "কাদম্বরী" তে মহাশ্বেতার চরিত্রে। মেয়েদের শুধুমাত্র পৈতে পরার অধিকারই ছিল না, গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সুযোগও ছিল সমান। মাধবাচার্যের লেখাতে ছেলেদের মতই ৮ বৎসরে মেয়েদের উপনয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানী মহিলাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত, যেমন "ঋষিকা" (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী) "ঋত্বিকা" (যিনি যজ্ঞের অধিকারিনী) "ব্রহ্মবাদিনী" (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন) "মন্ত্রনীদ" বা "মন্ত্রদৃক" (যিনি মন্ত্র বা

বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন) "পন্ডিত" ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারতের কুন্তি, কৌশল্যা তারা দ্রৌপদী ইত্যাদি নামের সঙ্গে "ঋত্বিকা" এবং "মন্ত্রনীদ" শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

"উত্তর রামচরিত" এ বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সঙ্গে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ আছে।

"বৃহদারণ্যক উপনিষদ্" - জনক রাজ্যে রাজা বিদেহর রাজ্যসভায় গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাজিত করেছেন।

উপনিষদে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায়, যেমন - সুলভা, প্রক্তহিতেয়ী, মৈত্রেয়ী, কার্যকাশিনী ইত্যাদি। পাণিনির লেখাতেও "ছাত্রীশালা" (ছাত্রীদের জন্য বাসস্থান) "আচার্যিনী" অর্থাৎ মহিলা শিক্ষিকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের যুগেও এই প্রথা চলতে থাকে। শুধু দর্শন বা তর্কশাস্ত্রেই নয়, মেয়েরা নানা রকম শিক্ষা অর্জন করতেন। যেমন মেয়েদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছিল না। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসন কালে চিত্রাঙ্গদার নাম আমরা পাই একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে। সুভদ্রা ছিলেন এক দক্ষ রথ চালক বা সারথি। মৃদগলিনী রথ পরিচালনা করতেন এবং সশস্ত্র হয়ে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বিসপালা যুদ্ধে তাঁর একটি পা হারান এবং অশিনীর কৃপায় কৃত্রিম লৌহ পা ব্যবহারে সক্ষম হন।

পাণিনি বলেছেন যে সকল নারীগণ কণ্ঠ উপনিষদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তাদের বলা হত "কণ্ঠী" কল্পতে যাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের বলা হত "কল্পী" পাতঞ্জলী মহিলা শিক্ষিকাদের "ঔষমেধা" এবং শিক্ষার্থীনীদের "ঔষামেধী" বলে উল্লেখ করেছেন। মহিলারা তর্কসভায় বিচারকের আসনও গ্রহণ করতেন। যেমন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে মদন মিশ্রের তর্কসভার বিচারক ছিলেন মদন মিশ্রের স্ত্রী উদয়ভারতী।

সামরিক শাস্ত্রে দক্ষ মহিলা বল্লভরাজকে বলা হত "শক্তিনী"। কথিত আছে যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় মহিলা রক্ষীরা ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে মহিলারা নানা কলায় জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেতেন। কিছু কলা ছিল যেগুলিতে তাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখাতেন। যেমন - রন্ধন কলা, অঙ্কন নৃত্য, সংগীত, সেলাই, সীবন শিল্প, বয়ন তাঁদের কাজ ইত্যাদি।

অথর্ব বেদে বলা আছে যে ব্রহ্মচর্য যাপন না করলে একজন কুমারী বিবাহযোগ্য হিসাবে গণ্য নয়। মেয়েদের বেদ ও বিজ্ঞান চর্চা করে নিজেদের চরিত্র গঠন করে তবেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিৎ।

তখন মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স ধরা হত ১৬-১৭ বৎসর। শুধু তাই নয়, মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার পেত। বিবাহ পরবর্তী সময়েও মেয়েরা চাইলে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকল এবং তার প্রভাব দেখা যেতে লাগল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মনুর যুগ থেকে নারীর সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে লাগল এবং নারী শিক্ষার অবনতি হতে লাগল। এই সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধ কঠরভাবে প্রয়োগ হতে শুরু করে সমাজ ক্রমশ আচার সর্বস্বতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। মনুর বিধানে মেয়েদের বিবাহকে বৈদিক পাঠের সমতুল্য, স্বামী সেবাকে আশ্রমিক জীবনের সমান এবং গৃহকর্মকে সন্ধ্যা প্রার্থনার সমতুল্য হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়ে মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা ও শিক্ষালাভের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় মেয়েদের পরাধীন অন্তঃপুরে নির্বাসিত জীবনযাত্রার পথিকৃৎ ছিলেন। মনু রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কুমারী অবস্থায় কন্যারা থাকবে পিতার অধীনে, বধূ অবস্থায় স্বামীর অধীনে এবং বার্ধ্যক্যে পুত্রের অধীনে। তাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন বলে আর কিছু থাকবে না।

মনু পরবর্তী সময় মেয়েদের বিবাহের বয়স মেনে আসে ১০-১২ বছরে। এতে তাদের ধর্মীয় মর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা এবং শিক্ষালাভের সুযোগে দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। উপনয়ন বা গুরুগৃহে বৈদিক রীতি অনুযায়ী বিদ্যারম্ভ থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হতে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং যজ্ঞসমানে তাদের অধিকার হ্রাস পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হতে ক্রমশ পুরুষের আজ্ঞাধীন অন্তঃপুরে বন্দিনীর জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। তবে গৃহকর্ম শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা, সংগীত ও অঙ্কন শিক্ষা তারা তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে অপ্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে অনুকরণ, মৌখিক নির্দেশ, শিক্ষাণবিশি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করতে পারত। সেক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার কোনও সুযোগ বা ক্ষমতা থাকত না।

বর্ধিষ্ণু এবং রাজ পরিবারের মেয়েরা অবশ্য তখনো শিক্ষার সুযোগ পেতেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পাঠ, কাব্য চর্চা, গৃহকর্ম শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা, সংগীত-কলা ও অঙ্কন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তখনও তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমানেই ছিল।

ভারতের ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে নারী শিক্ষারও একটা আমূল বিবর্তন ঘটেছে। আময়া এটাও দেখতে পাই যে শিক্ষার সঙ্গে একটা সম্পর্ক জড়িত আছে। বৈদিক যুগে যখন নারীর ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সমান অধিকার ছিল, তখন তারা

শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রেও পুরুষদের সঙ্গে সমান সুযোগ পেত। অপরদিক দিয়ে দেখতে গেলে, নারী শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সম-অধিকার লাভ করেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) বসু, যোগীরাজ : বেদের পরিচয়, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬২।

২) শাস্ত্রী, গৌরীনাথ : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬২।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম সংস্করণ : জুলাই (১৯৮৮) দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর (২০০০)

৪) গোপ, যুধিষ্ঠির : বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট (২০০৩)

৫) দাস, দেবকুমার : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, স্বদেশ, প্রথম প্রকাশ (১৪০৪), দ্বিতীয় প্রকাশ (১৪০৬), দশম সংস্করণ (১৪১৮)।

৬) ভট্টাচার্য, সুকুমারী : ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৬০ (প্রকাশকাল)

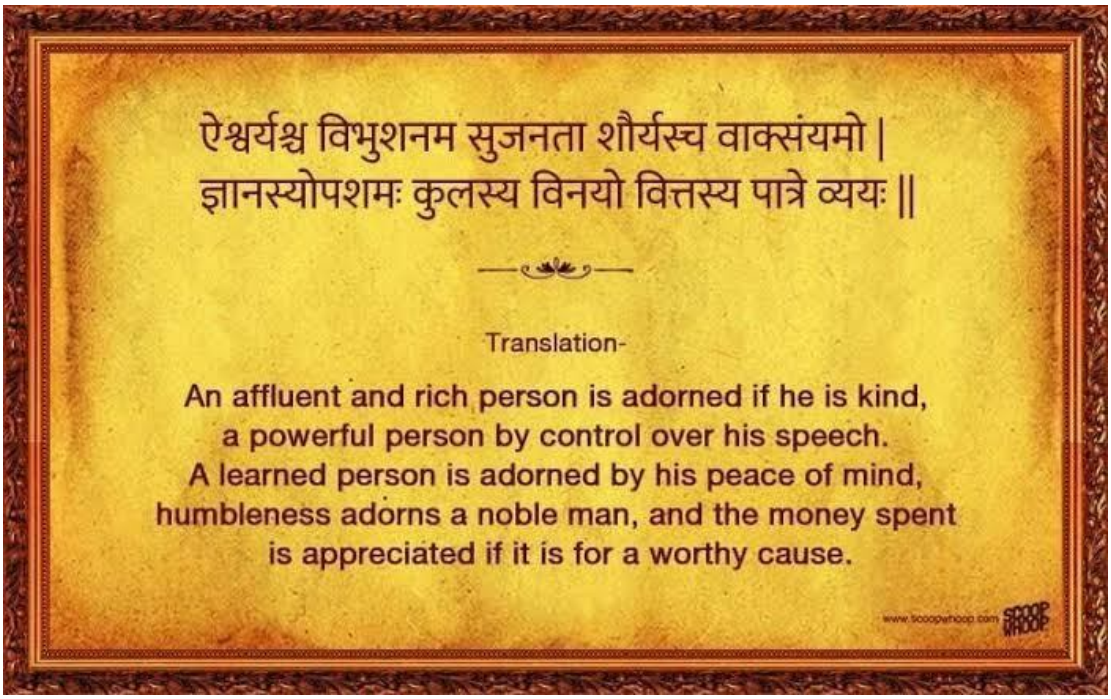

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকে প্রতিফলিত সমাজচিত্র

রিঙ্কি পাল
সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ-
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ
কোথা সেই উজ্জয়িনী – কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ–অধিরাজ।
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা গান-গীতিসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া-’পরে।।

রবীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, ‘কালিদাসের প্রতি’

নাটককে জীবন দর্পণ বা সাহিত্য সমাজের দর্পণ বলা হয়। সমাজে তার ভালো-মন্দ, তৎকালীন রীতি-নীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সমাজের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধি লাভ করে, তেমনি আবার সাহিত্য নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা চলে না। মহাকবি কালিদাস তাঁর সকল সাহিত্যে সমাজকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালিন সমাজে নারী ও শিশুদের কথ্য ভাষা ছিল পালি এবং প্রাকৃত, এছাড়াও তপস্বিদের জীবনযাত্রা প্রভৃতি সামাজিক দিক সমূহের সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রতিফলিত সমাজের বিভিন্ন দিকসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে পরিবেশিত করা হল –

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা :

মহাকবি কালিদাসের সময় সারা দেশ বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদের সর্ব্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হত। ধর্মশাস্ত্রকার মনুর নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চার বর্ণের মানুষেরা নিজ কর্তব্য অনুসারে নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে চলত এবং এই কর্তব্যে সামান্য উপেক্ষা অথবা কর্তব্যে কোনো ভুল-ত্রুটি হলে ঋষি অথবা মহর্ষিদের দ্বারা অভিশপ্ত ও তিরস্কৃত হতে হত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থাঙ্কে –

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"

অর্থাৎ যাকে অনন্যমনে চিন্তা করতে গিয়ে তুই উপস্থিত তপস্বী আমাকে অবজ্ঞা করলি, সে কিন্তু তোকে মনে করিয়ে দিলেও, পাগল যেমন তার আগের বলা কথা আর মনে করতে পারে না, তেমনি, তোকে আর মনে করতে পারবে না। রাজারাই ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠ রক্ষক। সে যুগ যাগযজ্ঞে পশুহত্যার প্রচলন ছিল। বর্ণ অনুসারে নির্দিষ্ট বৃত্তি পালন অপরের চোখে নিন্দনীয় হলেও তারা নিজেরা কখনও অমর্যাদা করত না। বরং পুরুষানুক্রমে ধর্মপালন করাই গৌরবজনক কার্য বলে গণ্য করা হত।

রাজা ও তাঁর শাসন কার্য :

মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িককালে অথবা তাঁর পূর্বকাল থেকেই সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র–বৃহৎ বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজ্য শাসন করতেন। আবার কখনও কখনও যুদ্ধ বিগ্রহও হত। রাজাও শাস্ত্রবিধান পালন করতেন। মহাকবির মতে– "শৌর্যহীন রাজনীতি কাপুরুষদের লক্ষণ, এবং নীতিহীন শৌর্য– পশু বৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্য রাজাদেরও শৌর্য ও নীতি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হত। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের শ্লোক থেকে জানা যায় রাজ্যের প্রজাসাধারণ রাজাকে তাদের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বার্ষিক কর হিসাবে দিত।

"যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যা নৃপানাং ক্ষয়ি তদ্ধনম।
তপঃ ষড়ভাগসক্ষয্যং দদত্যারন্যকাঃ হি নঃ।।"

অর্থাৎ- "ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণ থেকে যে ধন কর রূপে গৃহীত হয়, রাজাদের সে ধন নশ্বর, কিন্তু অরণ্যবাসী মুনিগণ তপস্যালব্ধ ফলের যে ষষ্ঠাংশ রাজাগণের সম্মানার্থে দান করেন, তা অবিনশ্বর।

বিবাহ প্রথা :

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক থেকে জানা যায় মহাকবি কালিদাস যে যুগের নাট্যকার ছিলেন সে যুগে অসবর্ণবিবাহ, গান্ধর্ববিবাহ ও বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নাটকের প্রথমাঙ্কে আশ্রমে প্রবেশ মাত্র রাজার বাহুর স্পন্দন এবং তার ফল স্বরূপ স্ত্রী লাভ ইচ্ছা– এটি তার দক্ষিণবাহু স্পন্দন অনুসারে যে শুভ সূচনা তা তিনি অনুভব করেন। এই সময়ে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল তা আমরা জানতে পারি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটি থেকে। এছাড়াও ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা থেকে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, অসুর, গান্ধর্ব ইত্যাদি হিন্দু বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। এই নাটকটি থেকে জানা যায় রাজা দুষ্যন্তের বহুবিবাহ হওয়া সত্ত্বেও শকুন্তলার প্রতি তাঁর যে অনুরাগ এবং শকুন্তলাকে লাভ করার জন্য তার যে বাসনা সেই প্রসঙ্গে -

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্যমে।
সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়াম।"

অর্থাৎ– বহু বিবাহ থাকলেও আমাদের কুলের প্রতিষ্ঠা কেবল দুটি উপকরণের উপর নির্ভরশীল। তার একটি হল সমুদ্রবেষ্টিত পৃথ্বী এবং তোমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা থেকে যে আট প্রকার বিবাহের কথা জানা যায়, তার মধ্য গান্ধর্ব বিবাহে বর এবং বধূ পরস্পরের সম্মতির উপর নির্ভর করে গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোনো মনোরম প্রাকৃতিক নিভৃত পরিবেশে মিলিত হয়ে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।

নারী শিক্ষা :

মহাকবি কালিদাসের সময়কালে যে নারী শিক্ষার অধিক প্রচলন ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রাচীন বেদের যুগে সুশিক্ষিত নারীদের মধ্যে উল্লেখয্যেগ্য গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি বিদূষী রমণীগণ। সে যুগেও নারীদের শিক্ষা শুধু গ্রন্থ পাঠেই ছিল তা নয়, শ্রুতি অর্থাৎ মুনি ঋষিদের কাছ থেকে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থগুলির শ্রবণের মাধ্যমেই তাদের শিক্ষা দান করা হত। কালিদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটিতে প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার শ্লোক উচ্চারণ শোনার পর এবং তাদের পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ বিষয়ে জ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ পাওয়ার পর নারী শিক্ষার বিস্তার যে সে যুগেও কতখানি তা জানা যায় –

"হলা শকুন্তলে, অন্যভ্যন্তরাঃ খলু বয়ং মদন গতস্য বৃত্তান্তস্য।
কিন্তু সাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কামষ মানানামবস্থা শ্রুয়তে তাদৃশীংতে প্রেক্ষো।"

অর্থাৎ- হে শকুন্তলা আমাদের নিজেদের প্রেমবিষয়ক অভিজ্ঞতা নেই বটে, কিন্তু ইতিহাস, পুরাণ, লোককথা, গল্প প্রভৃতিতে প্রেমিকাদের যেরূপ অবস্থার কথা শুনেছি; তোমার অবস্থাও সেইরূপ।

নারীদের বৈবাহিক জীবনের কর্তব্য :

"শুশ্রাষস্বন্ গুরুন কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষনতয় মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠংভব দক্ষইনা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধ্যঃ।।"

অর্থাৎ- গুরুজনের সেবা করবে, সপত্নীদের প্রতি প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করবে, স্বামী কর্কশ ব্যবহার করলেও রাগের বশে স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলবে না। পরিজনদের প্রতি যথেষ্ট দয়া– দাক্ষিণ্য বজায় রাখবে; নিজের ভাগ্যে গর্বিত হয়ো না। এইরকম ব্যবহারের দ্বারাই যুবতীরা গৃহিণীর মর্যাদা পায়। যারা এর বিপরীত আচরণ করবে তারা সংসারের যন্ত্রনার কারণ হবে। মহাকবি কালিদাসের কালে কন্যার বিদায়ের সময় পিতা কন্যাকে সুগৃহিণী হবার উপদেশ দিতেন তা এই শ্লোকটির দ্বারা স্পষ্ট এবং সেই যুগে সমাজে সুগৃহিণী হওয়া কতখানি প্রয়োজন তা পরিস্ফুটিত হচ্ছে উক্ত শ্লোকটির মধ্য দিয়ে।

ব্যবসা বাণিজ্য :

মহাকবি কালিদাসের সময়কালে অর্ন্তদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। চীন, শ্যাম, কাম্বোজ ইত্যাদি দেশের মধ্যে নানা পণ্যের আদান প্রদান ছিল। মহাকবি কালিদাস তার নাটকের মধ্য দিয়েই চীনের রেশমের বস্ত্রের কথা উল্লেখ করছেন। এর থেকে নিশ্চিত ভাবে জানা যায় চীন দেশের সাথে পণ্যের আদান প্রদান ছিল –

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।।"

অর্থাৎ, বাতাসের প্রতিকূলে নিয়ে যাওয়া পতাকার (চীন্ দেশের তৈরী) বস্ত্রের মতো আমার দেহ সামনের দিকে অগ্রসর হলেও চঞ্চল এই মন কিন্তু পেছনে ধাবিত হচ্ছে। এছাড়া এই নাটকটির ষষ্ঠ অঙ্কে বর্ণিত নৌব্যবসায়ী ধন মিত্রের নৌব্যসনে মৃত্যুর ঘটনা থেকে আমরা সেকালের নৌবাণিজ্য সম্পর্কে জানতে পারি।

পুলিশ প্রশাসন এবং শাসন ব্যবস্থা :

বর্তমান যুগের মতো সে যুগেও পুলিশ ব্যবস্থার মত আরক্ষ বিভাগ ছিল। এ যুগে যেমন পুলিশ বিভাগের অধিকর্তা আছে সে যুগে ছিল নগর রক্ষী দলের অধিকর্তা, এই পদগুলি রাজার শ্যালক গ্রহণ করতেন এবং নগরের কোনো নাগরিকের থেকে বলপূবর্ক কোনো দ্রব্য হরণ করে কিনা সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হত। এই বিষয়ে আমরা দেখেছি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে উল্লেখিত দুই রক্ষী পুরুষ

জানুক ও সূচক কোনো এক ধীবরের নিকটে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখে তাকে নানাভাবে মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখানো হয়েছিল। তবে এই রক্ষী পুরুষগণ উৎকোচ গ্রহণে যেমন অভ্যস্থ ছিল, তেমনি মদ্যপানে আসক্ত ছিল। সেকালের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। শাসন ব্যবস্থা ছিল কঠোর প্রকৃতির। সাধারণ চুরির অপরাধে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হত এবং আত্মপক্ষ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কোনো সুযোগ পেত না।

মৃত্যুদন্ড বিবিধ প্রকারে কার্যকর করা হত। এবং মৃত্যুর পূর্বে অপরাধীকে ফুলের মালা পরিয়ে সজ্জিত করা হত। এই মৃত্যুদন্ডগুলি ছিল অতি ভয়ানক। সে যুগে অপরাধীদের মাটিতে অর্ধেক প্রোথিত করে ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা হিংস্র শকুনিকে দিয়ে জীবন্ত ভক্ষণ করিয়ে দেওয়া হত অথবা মত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট করিয়ে অথবা শূলে চড়িয়ে অপরাধীর প্রাণ নাশ করা হত এবং উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান মৃত পিতার সম্পদের অধিকারী হত।

পুরুষদের অলংকার ব্যবহার :

শুধু স্ত্রীরা নয় সে যুগের পুরুষেরা অলংকার পরিধান করত, হস্তে বলয়, কর্ণে কুন্ডল, কণ্ঠে হারলতা, বাহুতে অঙ্গদ ইত্যাদি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটিতে রাজা দুষ্যন্তের মণিখচিত স্বর্ণবলয় পরিধানের উল্লেখ পাওয়া যায় –

"ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ বিবর্ণমনীকৃতম্
মণিবন্ধনাৎ কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তংময়া প্রতিসার্যতে।"

অর্থাৎ- জাগরণের শীর্ণতাহেতু অশ্রুপাতে বিবর্ণমণিখচিত স্বর্ণবলয় মণিবন্ধ থেকে পুনঃ পুনঃ স্খলিত হয়ে আসে এবং আমার দ্বারা পুনরায় অপসারিত হয় ইত্যাদি।

স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব :

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোবর্শীয়ম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ও অনান্য সৃষ্টি থেকে জানা যায়, সে যুগ স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব ছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে যাত্রাকালে সুগৃহিনীর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর উপদেশ থেকে জানা যায় স্বামী কোনো কারণে স্ত্রীর প্রতি কর্কশ ব্যবহার করলেও স্ত্রী তা অম্লানবদনে সহ্য করবেন। কখনো ক্রোধের বশে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কোনো সতী নারী যদি বেশি দিন পিতৃগৃহে থাকে তবে সমাজে তাকে নিয়ে বিবিধ কুৎসা রটনা হত। স্থান অভিপ্রেত ছিল। এছাড়াও পত্নীর উপর পতির প্রভুত্ব ছিল সর্বতোমুখী।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার :

মহাকবি কালিদাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে মন্তব্য করেছিলেন "মনে আছে বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়ে নি। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রমননের যে সুগভীর একাত্মতা তা এই মন্তব্যের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

রবীন্দ্র কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ও তাঁর কাব্যের প্রতি মুগ্ধতা 'বনফুল' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে আখ্যাপত্র মুদ্রিত ছিল শকুন্তলার শ্লোকাংশ 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং করত্র হৈঃ'। এই কাব্যের নায়িকা কমলাও শকুন্তলার আদর্শে গড়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য রচনার প্রথম পর্যায়ে মানসী, সোনারতরী, চৈতালিতে কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেন কালিদাসের চিরন্তন সৌন্দর্যবোধের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও কোথাও কোথাও কালিদাসকথিত কোনো নীতিকথাকে আপ্তবাক্য রূপে স্মরণ করছিলেন। উদাহরণ হিসাবে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'– নাটকে শার্ঙ্গরবের উক্তির 'ভবন্তি নাম্রাস্তরব ফলোদৈগমর্নবাম্বভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ, অর্থাৎ– যে ব্যাক্তি স্বভাবে বড়মানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে একথা পুরানো হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কেবল যে কালিদাসের কাব্য থেকে রোমান্টিকতায় উপাদান আহরণ করেছেন তাই নয় তৎকালীন সময়ের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নানাবিধ তথ্য সংগ্রহও করেছেন। পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান। আবার শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ কাব্যে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিতও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন সেকালের ক্ষত্রিয়েরা বিবাহে যে কড়া নিয়ম বিধি মানতেন না, নর – নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণবশত ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের সমাজ সীমাও উল্লঙ্ঘন করতেন। কালিদাসের প্রায় সব কাব্যের মধ্যে তিনি এই সমাজদ্বন্দ্বের এই জায়গাটি লক্ষ্য করেছেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কালিদাসের কালে "ক্ষত্রিয় রাজারা বিবাহে সংযত আর্য আদর্শ লঙ্ঘন করে" কামনার অনুসরণে সমাজে অপজনন ঘটাচ্ছিলেন। 'ধর্ম ও সমাজ ছাড়াও সে যুগের রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাসের ইঙ্গিতও খুঁজে পেয়েছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের অনুসরণে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন– "প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে যে সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন।" তিনি কালিদাসের বর্ণনাকে বিশ্লেষণ করে অনুমতি ধারণায় উপনীত হয়েছেন। কালিদাসের কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেলেন সাহিত্যসৃষ্টির বিবিধ আদর্শ ও সৃষ্টির প্রেরণাও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কালিদাসের থেকে। সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ নির্ণায়ক একটি উদ্ধৃতি –

"যে কবির সাহস আছে, সুন্দরের সমাজে অতি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেনীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্ববনান্ত ও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল।"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৭

২। অভিজ্ঞান – শকুন্তলম্ অনিলচন্দ্র বসু, সং স্কৃত বুক ডিপো, ১৯৯৫

৩। বসু, চন্দ্রনাথ শকুন্তলাতত্ত্ব, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১২৯৬

৪। অভিজ্ঞান – শকুন্তলা, বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায়, জি.পি. রায় এন্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, ১২৬২

৫। अभिज्ञान शकुन्तलम्, वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, महालक्ष्मी प्रकाशन, आख्या, तृतीयः संस्करन, १९८१

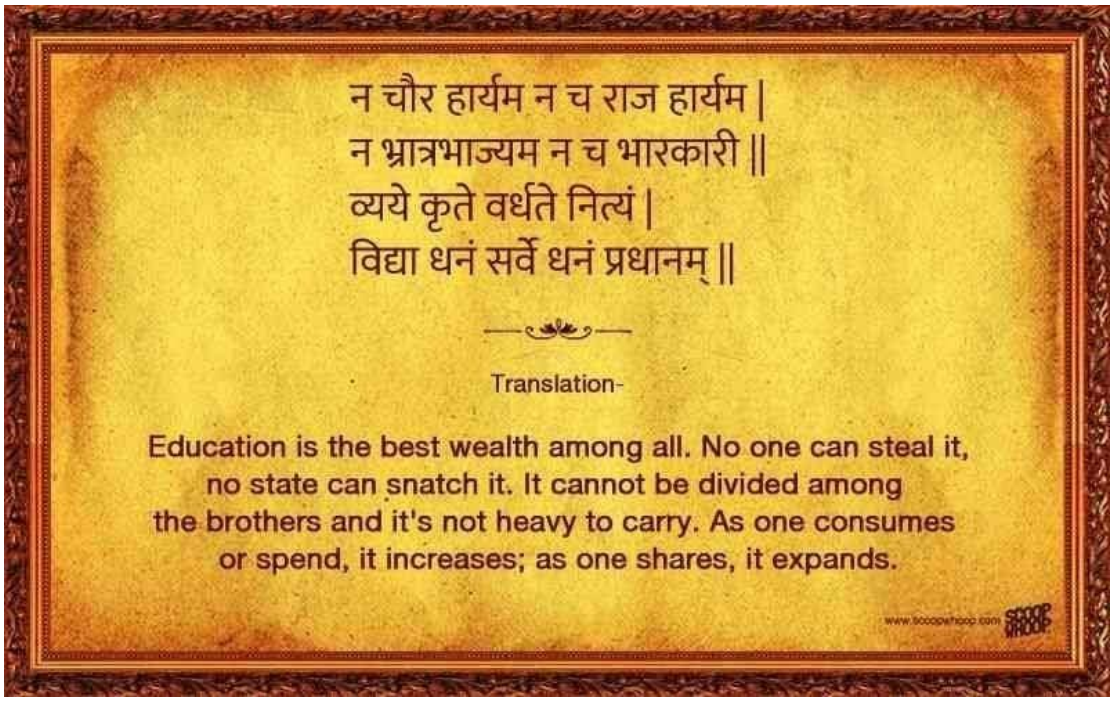

সংস্কৃত সাহিত্যে রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা

লাবণী পাল

সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্য জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। স্থানীয় নগরসভ্যতাকে পরাজিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে প্রবেশের পর থেকে কয়েকটি শতক ব্যাপী চলে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার আকরগ্রন্থ বেদ গঠনের কাজ। সেই সুদীর্ঘ সময় ভারতীয় ইতিহাসে বৈদিক যুগ বলে পরিচিত।

রাজতন্ত্র :

আর্যরা যাযাবর থাকলেও স্থানীয় নগরসভ্যতার সংস্কৃতিকে রপ্ত করে ভালোভাবেই। গড়ে ওঠে গ্রাম ও শহর। ঋগ্বেদে সুশাসক নগরপতির উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; তার ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় বেদে। ঋগ্বেদে রাজার উদ্দেশ্যে রচিত দুটি সূক্ত ১০/১৭৩ এবং ১০/১৭৪। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজা নির্বাচিত হতেন। তবে পুরুষানুক্রমে যে রাজারা রাজত্ব করে গেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ৭/৮ সূক্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবযান নামে এক রাজার কথা বলা হয়েছে, যার পুত্র দিবোদাস এবং নাতি সুদাস রাজা ছিলেন। নহুশ নামে আরো এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় ৭/৬/৫ তে। তিনি করও গ্রহণ করতেন। নহুশের পুত্র যযাতির রাজা ছিলেন।

বৈদিক রাজনীতি :

বৈদিক সাহিত্যে রাজনীতি বর্ণনা তেমন কিছু পাওয়া যায় না। একেকটি জনসমষ্টিকে গ্রাম বলা হয়েছে। আলাদা কয়েকটি জনসমষ্টিকে বা পরিবার নিয়ে সম্ভবত গ্রাম তৈরি হতো। ঋক্‌বেদে রাজা শব্দের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে। রাজাকে বিশপতি অর্থাৎ বিশ গোষ্ঠীর প্রধান বলা হয়েছে। কোথাও তিনি গোপতি নামে পরিচিত। বিপথ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যায় রাজা বিশোর সদস্যরা বিথের সদস্য ছিলেন। যুদ্ধে লুট করা সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা করতেন রাজা। রাজাকে ভূপতি অর্থাৎ জমির মালিক বলা হত। নৃ শব্দের অর্থ নর অর্থাৎ নরপতি মানুষের রক্ষা করি, রাজাকে নরপতিও বলা হত। ধীরে ধীরে রাজা গোষ্ঠীর নেতা হয়ে উঠলেন। রাজা যে এলাকাটি শাসন করতেন তাকে রাজ্য বলা হত। কুরু, পাঞ্চাল এর উদাহরণ। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দখল থাকলে তবেই রাজা হওয়া যেত।

দশ রাজার যুদ্ধ :

যুদ্ধ ঋগ্বেদে অনেক আছে। তার মধ্যে বিখ্যাত হল দশ রাজার যুদ্ধে। ভারত গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন সুদাস। তার সঙ্গে অন্যান্য দশটি গোষ্ঠীর রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সুদাস দশ রাজার জোটকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ভরত গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়েছিল। নদীর উপর একটি বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন সুদাস। হয়তো নদীর জলের উপর অধিকার বজায় রাখার জন্যই এমনটা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছুটা মিল রয়েছে।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা :

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এক জায়গায় রাজা হওয়ার একটা গল্প আছে। দেবতা ঔষধের মধ্যে যুদ্ধের প্রতিবারই দেবতারা অসুরদের কাছে হেরে যেতেন। চিন্তায় পড়ে দেবতারা জেতার উপায় ঠিক করার জন্য বসেন আলোচনায়। বোঝা যায় কোন রাজা না থাকার জন্যই দেবতাদের এই পরিণতি। এবার দেবতারা রাজা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু দেবতারা ইন্দ্রের নেতৃত্বে জয়ী হতে থাকলেন।

বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজ :

এই সভ্যতার পশুপালনই ছিল প্রধান জীবিকা। পশুই ছিল প্রধান সম্পদ। ঘোড়ার চাহিদাও ছিল খুব বেশী। কারিগরি শিল্প তখন কম ছিল। চামড়ার ব্যবহার হতো তখন। সোনার গহনার ব্যবহার ছিল। কামার, জেলে, রাখাল, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার কথা জানা যায়। এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলন প্রায়ই ছিলই না। তবে বিনিময় প্রথা ছিল। নিষ্ক, শতমান মুদ্রার ব্যবহার ছিল।

ঋক্‌বেদের গোড়ার দিকে বর্ণাশ্রম বা চতুর্বর্ণ প্রথা ছিল বলে জানা যায় না। ঋক্‌বেদে বর্ণ বলতে গায়ের রংকেই বোঝাত। তবে শেষের দিকে বর্ণপ্রথা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। গোষ্ঠীর গবাদি পশু রাখার জায়গাকে গোত্র বলা হত। বৈদিক সমাজে অনেক নারী শিক্ষা লাভ করতেন। এখানে পাশা খেলা ছিল খুবই জনপ্রিয়। রথ ও মহারাষ্ট্রের ঘোড়াদৌড়ের প্রতিযোগিতা হত। সেই সময়ে মানুষ মাংস খেত তাও জানা যায়।

বেদের যুগে কর দেওয়া নেওয়া :

গোষ্ঠী জীবনে প্রথম দিকে জমির ওপর নেতার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ব চালানোর জন্য তার ধন সম্পদের দরকার ছিল। তা সম্ভবত কৃষি থেকেই পেয়েছেন শাসকরা। পরবর্তী বৈদিক যুগে কর হয়ে উঠেছিল বাধ্যতামূলক। যুদ্ধে যারা হেরে যেত তাদের থেকেও রাজারা কর জোর করে আদায় করতেন।

সত্যকামের কথা :

সত্যকাম তার বাবার পরিচয় জানতো না। পড়াশোনার জন্য গুরুর কাছে গেলে গুরু তার গোত্র জানতে চান। সত্যকাম তার মা জবালাকির কাছে নিজের গোত্র জানতে চাইলো। জবানা বললেন "আমি তা জানি না।" কেউ জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে যে "তুমি সত্যমাক জাবাল" সত্যকাম গুরু গৌতম এর কাছে গিয়ে বলল- "আমি আমার গোত্র জানি না। আমার মা বললেন আমার নাম সত্যকাম জাবাল"।

চতুরাশ্রম :

পরবর্তী বৈদিক যুগে জীবন যাপনের চারটি ভাগ বা পর্যায় ছিল। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করা ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। শিক্ষা লাভের পর বিয়ে করে সংসার জীবন যাপনকে বলা হত গার্হস্থ্যাশ্রম।

বৈদিক সমাজ ও ধর্ম :

বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। ধর্মচর্চা মূলতঃ যাগযজ্ঞ আচার কেন্দ্রিক ছিল। এই সময় ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, মিত্র, সোম প্রমুখ দেব ও উষা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ফলে ধীরে ধীরে বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রূপ নেয়।

বৈদিক যুগের শিক্ষা :

বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরু প্রধান। পড়াশোনা হত মুখে মুখে। এ যুগের লিপির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত মনে হলে উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরু সেই ছাত্রকে মেনে নিতেন। মেয়েদেরও উপনয়ন হত।

বৈদিক পড়াশোনা ও বিজ্ঞান চর্চা :

বৈদিক যুগে জামিতিক আকার আশ্রিত যজ্ঞবেদি বানানোর জন্য মিস্ত্রি আর স্থাপতিদের গণিত চর্চা শিখতে হত। যজ্ঞের জন্য জ্যোতিষ বিজ্ঞান ও অথর্ববেদে চিকিৎসাবিজ্ঞানও শেখানো হত।

ঋক্‌বৈদিক যুগে পরিবার ছিল সমাজের সবনিম্ন স্তর। এই পরিবারই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হতো Clan বা গোষ্ঠী কয়েকটি Clan নিয়ে গঠিত হত ট্রাইব বা উপজাতি। ঋক্ বৈদিক যুগে এই ট্রাইব বা উপজাতিই হলো সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্বর বা রাষ্ট্র।

এই যুগে কোনো নিয়মিত কর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। বেদের পরিচয় - যোগীরাজ বসু, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলিকাতা ১৯৫৭

২। ভট্টাচার্য, সুকুমারী - ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য প্রকাশকাল - জানুয়ারি ১৯৬০

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ - সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, প্রশান্ত - সারস্বত লাইব্রেরী প্রেস, কলিকাতা - আশ্বিন ১৩৬২

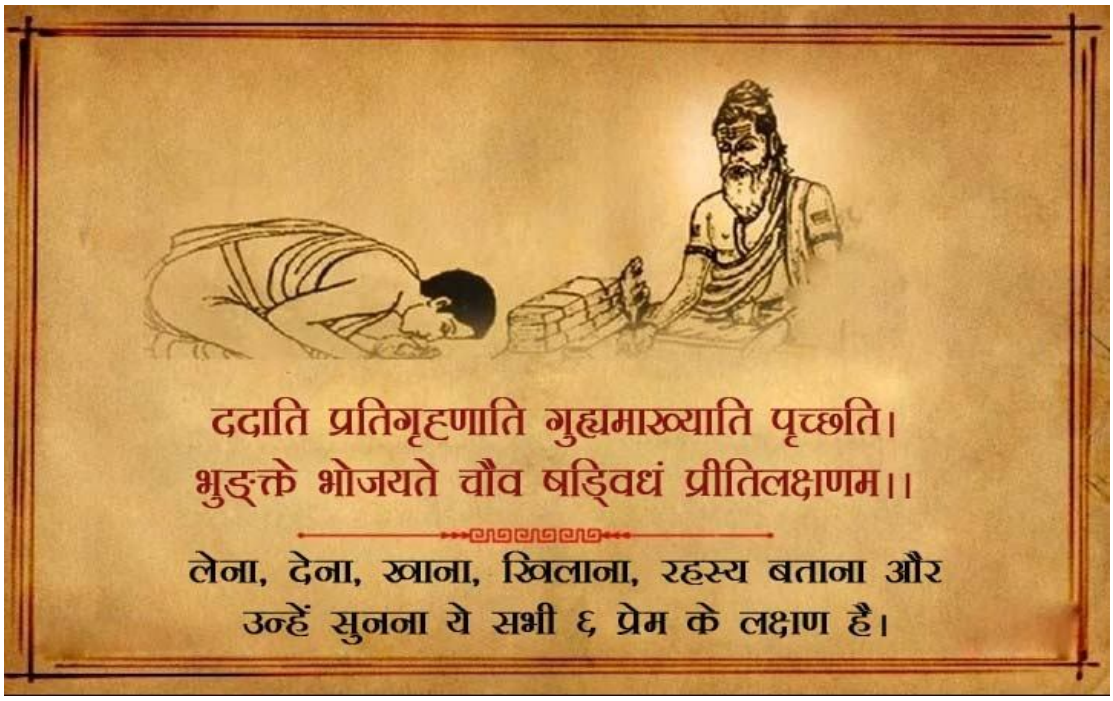

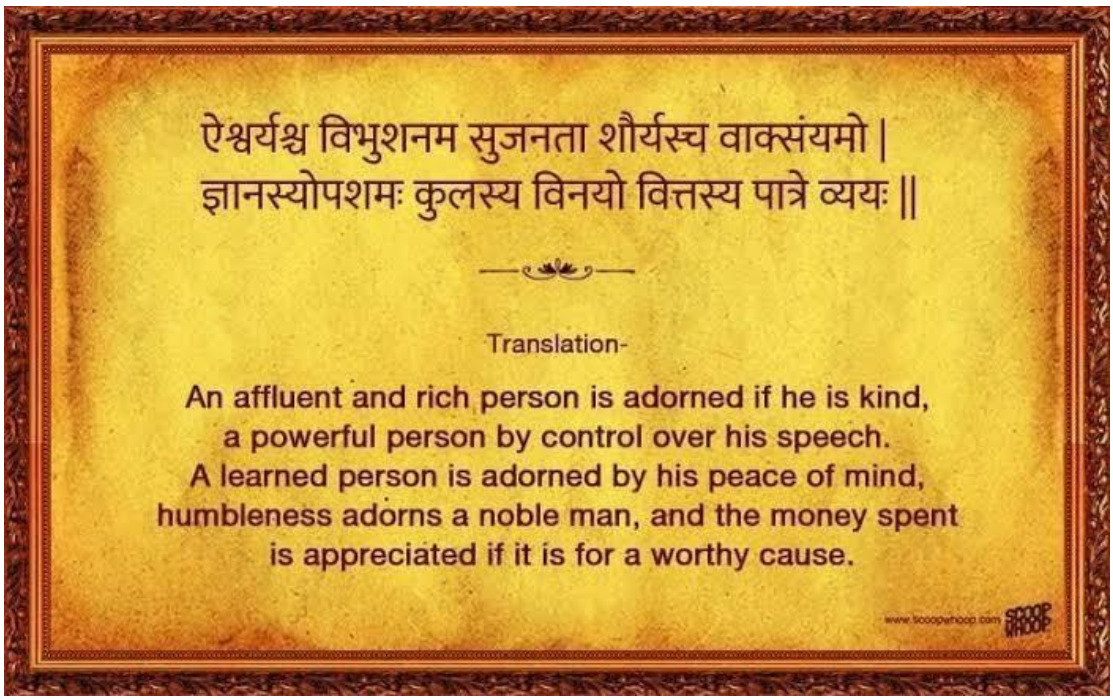

কবি জয়দেব এবং গীতগোবিন্দম্

দীপজ্যোতি মন্ডল

সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্র

গীতগোবিন্দমের রচয়িতা কবি জয়দেব খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জয়দেবকে বাঙালি কবি বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো আধুনিক গবেষক ওড়িশার পুরীর কাছে ‘কেন্দুলি শাসন’ নামক এক স্থানকেই জয়দেবের জন্মস্থান বলে দাবি করেন। তবে এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। কবির ব্যক্তিগত জীবনের জন্য খুবই কম জানা যায়। তবে তাঁর জীবন নিয়ে বহু অলৌকিক ঘটনা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী তাঁর সম্পাদিত গীতগোবিন্দমের ভূমিকাতে কবি জয়দেব জীবনী উল্লেখ করেছেন জীবনীটি এইরকম -

বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীজয়দেব কবি জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের বর্তমান নাম কেন্দুলি। জয়দেবের বাবার নাম ভোজদেব ও মায়ের নাম বামাদেবী। জয়দেব বাল্যবয়সেই বিরাগী হয়ে পুরী যান এবং সেখানে শ্রী জগন্নাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জগন্নাথের কৃপায় তিনি অল্পদিনেই নিজেকে পুরীতে পরিচিত লাভ করেন। এই সময় তিনি উৎকলরাজের নজরে পড়েন এবং রাজসভায় তার স্থান হয়।

এক সময় জনৈক সন্তানহীন ব্রাহ্মণ সন্তান লাভের আশায় জগন্নাথ সেবা করেন। জগন্নাথের আশীর্বাদের ব্রাহ্মণ একটি সর্বসুলক্ষণা কন্যাসন্তান লাভ করেন, এবং তার নাম রাখেন পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর বিবাহের বয়স হলে দরিদ্র বাবা তাকে জগন্নাথের চরণে অর্পণ করেন। এরপর জয়দেব ওই কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। যদিও ভক্ত জয়দেব সংসার বিবাগী তবুও প্রভুর আদেশ মেনে নিয়ে পদ্মাবতীর পাণি গ্রহণ করে গৃহী হলেন। এরপর জয়দেব ঘরে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সেবার জন্য নিজের স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিযুক্ত করলেন। এই দেব বিগ্রহের সেবায় উভয়ের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় ভেসে গেল। এই যে জগৎস্বামী জগন্নাথের প্রসাদে জয়দেব পদ্মাবতী পরস্পর মিলিত হলেন, এটিই হল গীতগোবিন্দম্ রচনার পবিত্র সূত্র।

জয়দেব একদিন গীতগোবিন্দ লিখতে বসে “স্মর গরলখন্ডনং, মম শিরসি মন্ডনং” লিখে চিন্তা করেও পরবর্তী পদপূরণ করতে পারল না। পুঁথি বন্ধ করে সাগরে স্নান করতে গেলেন। এই সময় ভক্তের ভগবান শ্রী কৃষ্ণ জয়দেব দেহ ধারণ করে এসে তাঁর চিন্তার ভার লাঘব করার জন্য কলমে একটু

কালি তুলি নিয়ে সেই পদ পূরণ করেন - "দেহি পদপল্লবমুদারম্"। শুধু তাই নয় ভগবান জয়দেব পত্নি পদ্মাবতীর হাতে অন্নসেবা গ্রহণ করেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী সবকিছু জানতে পেরে চমকিত হয় এবং তাদের ভক্তির বাধ আরো দৃঢ় হয়।

এরপর কোনো এক সময়ে গীতগোবিন্দমের পদগুলি শুনে ভগবান গোবিন্দ যে খুশি হয়েছেন তা বোঝাতে পেরে উৎকলরাজ নতুন একটি গীতগোবিন্দ রচনা করে জগন্নাথের চরণতলে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সঙ্গে রেখে দেয়। পরদিন মন্দির খুললে দেখা যায় যে রাজার রচিত গীতগোবিন্দটি বিগ্রহ বেদীর নীচে পড়ে রয়েছে। রাজার গীতগোবিন্দ যে তুচ্ছ বোধে অপসারিত হয়েছে এবং গৌরব বোধে জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ রক্ষিত হয়েছে এই বার্তা আকাশবাণীর মাধ্যমে ধ্বনিত হয়।

জয়দেব একসময় বৃন্দাবনে যান। জয়দেব বৃন্দাবনের বনে বনে গোষ্ঠে গোষ্ঠে পদাবলি গান করে ঘুরে বেড়াতেন তারপর কিছুদিন বাদে নিজের গ্রামকেন্দুবিল্বে ফিরে আসেন ও রাধামাধবের শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পত্নি পদ্মাবতীর সঙ্গে একসাথে সেবা পূজার আত্মনিয়োগ করেন। এই উপলক্ষে কেন্দুবিল্বে এক বড়োমেলা বসে গেল। এখনো এখানে প্রতিবছর মহামেলা হয় এবং বহু বৈষ্ণবের সমাগম হয়। মোটামুটি সংক্ষেপে জয়দেবের জীবনী হিসাবে এইটুকুই লিপিবদ্ধ করেছে সম্পাদক।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত বলে এই বইতে গীতগোবিন্দমের শ্লোক উদৃত হয়েছে। সুতরাং তিনি যে দ্বাদশ শতকের কবি ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার কাব্যগ্রন্থ থেকে পরিষ্কার যে তিনি গান জানতেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের গীতিকাব্য প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক ম্যাকডোনেল বলেছেন বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলি অন্যতম। কবির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ যখন গীতিময় কাব্যরূপ লাভ করে, তখন তাকে গীতিকাব্য বলে। যে কাব্য বীনা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ গীত হওয়ার যোগ্য, যে কাব্য পাঠ করলে পাঠকের অন্তরে আবেগ জেগে ওঠে, যার সুর ও ধ্বনি অন্তরের অন্তস্থলকে মথিত করে, সেই কাব্যকেই বলে গীতি কাব্য। গীতিকাব্য সাধারণত তিন প্রকারের - (১) শৃঙ্গারাত্মক, (২) নীতিমূলক এবং (৩) ভক্তিমূলক। ভক্তিমূলক গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'।

গীতিকাব্য হিসাবে কালিদাসের 'মেঘদূতম্'-এর পরেই যার স্থান, সেটি হল 'মধুর-কোমল কান্ত' পদাবলির রচয়িতা জয়দেবের ভক্তিমূলক গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দম্'। চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন- "চন্ডীদাস বিদ্যাপতি / রায়ের নাটক গীতি / কর্ণামৃত শ্রী গীতগোবিন্দ। / স্বরূপ রামানন্দ সনে / মহাপ্রভূ রাত্রিদিনে / নাচে গায় পরম আনন্দ।। "

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বসন্তকালীন লীলাকে কেন্দ্র করে জয়দেব এই ভক্তিমূলক গীতিকাব্য রচনা করে। এছাড়া, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সাত-বাহন হাল সংকলিত গাথা সপ্তশতী নামক কাব্যের প্রভাব 'গীতগোবিন্দম্'-এ কমবেশী রয়েছে।

'গীতগোবিন্দম্' নামকরণটি সবদিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত। কারণ এই কাব্যের নায়ক গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণ, যিনি বিশ্বাত্মার প্রতীক। নায়িকা শ্রীরাধারাণী জীবাত্মার প্রতীক। বিশ্বাত্মা এবং জীবাত্মার বিচ্ছেদ ও মিলন বর্ণনাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য। এই কাব্যের চিত্রধর্মিতা ও গীতিপ্রাণতায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে উপায় নেই। ভক্তি ও শৃঙ্গাররসের অপূর্ব সংমিশ্রণ এখানে ঘটেছে। এই গীতিকাব্যে ২৪টি গীতের সমাবেশও রয়েছে। তাই নামকরণ সার্থক।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' রাধাকৃষ্ণের শ্বাশ্বত প্রেমলীলাকে উপজীব্য করে রচিত। এই কাব্যে ১২টি সর্গ, ৮০ টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমাবেশ রয়েছে। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে গ্রন্থটি দার্শনিক সমাদৃত।

প্রথম সর্গে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহ ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় সর্গে, উভয়ের মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা, তৃতীয় সর্গে শ্রী রাধার জন্য শ্রী কৃষ্ণের চিন্তা, চতুর্থ সর্গে কৃষ্ণের কাছে সখির মাধ্যমে রাধার অবস্থা নিবেদন, পঞ্চম সর্গে রাধার প্রতীক্ষা, ষষ্ঠ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বার্তার প্রতিফলন, সপ্তম সর্গে কৃষ্ণের ব্যাকুলতা, অষ্টম সর্গে রাধার মান, নবমসর্গে রাধার মানভঞ্জনের চিন্তায় কৃষ্ণের ব্যাকুলতা, দশম সর্গে রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুনয়। একাদশ সর্গে উভয়ের মিলন সম্ভাবনার উল্লাস এবং দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিলাস বর্ণিত হয়েছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দমের' কাব্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল - (১) জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' এর কাব্যবৈশিষ্ট্যগুলি হল নাট্য গীতের অন্ধকারে লেখা কাব্য তবে এর গানগুলি অপরিহার্য ও মর্মস্পর্শী। তাই নাট্যগুণ তুলনায় গৌণ। উক্তি- প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। পাত্রপাত্রী মাত্র তিনজন - সখী, কৃষ্ণ ও রাধা। কাব্যের অমূল্য সম্পদ এই গান গীতিকবিতার মত হৃদয় ভাবের প্রকাশে ঝঙ্কৃত। (২) জয়দেবের কাব্যসংস্কৃতিতে রচিত হলেও তার ভাব ধর্ম একান্তভাবে লৌকিক প্রাণ ধর্মের অনুকূল। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীকে আধ্যাত্মিক রূপ দানে প্রয়াসী হবেন। (৩) গীত গোবিন্দম্ মিলনান্তক ভক্তিমূলক গীতিকাব্য। বিরহী রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা দিয়েই এই কাব্য শেষ হয়েছে। (৪) পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের কবি জয়দেব অপার্থিবকে পার্থিব রূপে ও রসের সীমানায় লাভ করতে প্রয়াসি হয়েছেন। (৫) জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলির পদলালিত্য ও ললিতা মাধুরি সত্যই হৃদয় গ্রাহী।

এক কথায় কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' সংস্কৃত সাহিত্যে ও বৈষ্ণব সমাজে এক অন্যতম দান।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। বৃহৎ শ্রী শ্রী গীতগোবিন্দ - শ্রী নরহরি দাস কৃত পদানুবাদ, শ্রী পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

২। কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ - শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা।

৩। GitaGovinda - Wikipedia, laenciclopedia lib

সংস্কৃত সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ

প্রিয়াঙ্কা মন্ডল
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

সংহতি অর্থাৎ সম্যক মিলন। সমাজ জীবনে সংহতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গভীর। এই জাতীয় সংহিতার মূলেই রয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। মানুষ সামাজিক জীব প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঐক্যতা ও সম্প্রীতির দ্বারা গড়ে ওঠে সুস্থ মানব সমাজ। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা, ঐকানুভূতিই মানবিকতার মূলমন্ত্র।

ঐক্যচেতনা বা ঐক্যানুভূতি, আন্তরিকতা, প্রেম, শ্রদ্ধা, একান্তবোধই মানবিকতার মূল সোপান সংস্কৃত সাহিত্য ভান্ডারে মানবিকতার বহু নিদর্শন আমরা পাই। ভারতীয় দর্শনের জৈন দর্শনে বলা হয়েছে - "অহিংসাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত"। সম্যক জ্ঞান লাভ, দর্শন লাভ ও সম্যক চরিত্রে লাভের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন সকল জীবের প্রতি প্রেম, ও ভালবাসার ও অহিংসাব্রত উদযাপন। ভগবান তথাগত ও বৌদ্ধদর্শনে মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য প্রচার করেছেন অহিংসা, প্রেম ও করুণার। যার মাধ্যমে আমরা মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা পাই। কিন্তু বর্তমান সমাজে মানুষই মানুষকে মনুষ্যেতর রূপ মনে, চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি। এই সবের মূল কারণ হল মানুষের ছয়টি অন্তঃশত্রু অর্থাৎ ষড়রিপু- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য। তাই আচার্য মনু তাঁর 'মনুসংহিতা' স্মৃতি শাস্ত্রের রাজধর্ম নামক সপ্তম অধ্যায় 'কামজ' ও 'ক্রোধজ' ব্যসনগুলি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন --

"দশকামসখখানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বির্বজয়েৎ"।।

কামন্দকীয় নীতিসারেও বলা হয়েছে -

"কামঃ ক্রোধতথা লোভহর্ষা মনমদস্তথা।
ষড়বর্গমুৎসুজেদেনং তস্মিংস্ত্যক্তে সুখী নৃপঃ"।

কিন্তু বর্তমান সমাজে মানুষ হয়েছে আরও ব্যসনাসক্ত। কাম, ক্রোধাদির জন্য মানুষ মানুষকে খুন করছে। মানুষই মানুষের হিংস্রতার শিকার। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে শোনা যায় -

"যতিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতে অর্জুন।

"কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসাক্তঃ স বিশিষ্যতে।।

অর্থাৎ যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে তিনিই শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সমাজে আসক্তি কামনার জন্যই বাড়ছে নারী বিগ্রহ, জীব হত্যা, অপরের সম্পদ হরণ। গীতায় আসক্তি শূন্যভাবে কর্ম করার নির্দেশ থাকলেও বর্তমান সমাজ আসক্তিভাবেই পরিপূর্ণ মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির উক্তি করেছেন -

"ধন্যানামুক্তমং দাক্ষাং ধনানামুক্তমং শ্রুতম।

লাভানাং শ্রেয় আরোগ্য সুখানানাং"।।

অর্থাৎ তিনি সন্তুষ্টিকে উত্তম সুখ বলেছেন। কিন্তু মানুষ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে সুখ প্রাপ্তির আশায় হয়ে ওঠে অসন্তুষ্ট। কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার জন্য সন্তুষ্টি হারিয়েছে মানব সমাজ। যার বেশি থাকে সে আরও চায়। এই লোভ বশতই আজ জরাজীর্ণ।

অহিংসা পরম ধর্ম :

এইবাণী মানবিক মূল্যবোধের দিশারী হলেও মানুষ হয়ে উঠেছে হিংস্রতার প্রতীক। অহিংসাকে যারা পাথেয় করে চলে তারাই বর্তমান সমাজে পান অবহেলা, যন্ত্রণা, অবশেষে মৃত্যু। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল বারাসাতের রাজীব হত্যা কান্ড। ২০১১ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারি দুষ্কৃতিদের হাত থেকে দিদিকে বাঁচানোর জন্য খুন হতে হয় রাজীব দাসকে। এই রকম দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের নীতিবাণী হল - 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এর 'অতিথি দেবোভবঃ' অর্থাৎ সর্ব বিশ্ব আমাদের আত্মীয় এবং অতিথি দেবস্বরূপ - যা মানবিকতার মূল্যবোধ, সবার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি, আন্তরিকতা, আত্মীয়তার ভাব ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু বর্তমান সমাজে তাঁর বিপরীত চিত্রই পরিদৃষ্ট হয়।

৪ই ফেব্রুয়ারি জয়পুরে এক বিদেশিনীকে যৌন হেনস্তা করা হয়। অতিথি দেবতুল্য এই নীতিকথা জেনেও আমাদের দেশে আশা অতিথিই হয় হেনস্তার শিকার।

সংস্কৃত সাহিত্যে আরও নানান গ্রন্থে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নীতিকথা আমরা জানতে পারি। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা তা প্রয়োগ করি না। অহিংসা, প্রেম, ভক্তি, ঐক্যবোধের মূল কারণ, জানা সত্ত্বেও আমরা ক্রমাগত, হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ, আশ্রয় গ্রহণ করি। মানবিক মূল্যবোধের নীতি কথাগুলো আজ গ্রন্থ পৃষ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ বর্তমানে আমরাই জ্ঞানপাপীর মত মানবিক মূল্যবোধকে হারানোর সুযোগ করি। যুব সম্প্রদায়েরা অসামাজিক কাজকর্মের বশবর্তী মত মানবিক মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলছি। সারা বিশ্বকে ধ্বংসের পথে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছি। গান্ধীজী বলেছেন -

“বুরা মাৎ বোলো, বুরা মাৎ দেখো, বুরা মাৎ শুনো।”

কিন্তু আমরা এখন সত্য বলব না, সত্য দেখব না, সত্য শুনবো না, মন্ত্রে মন্ত্রিত্ব। সর্বশেষে বলা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে আলোচিত নীতি বাক্যগুলি গ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে “মানবিক মূল্যবোধ” এবং শুরু হবে বিশ্ব উন্নয়ন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী অশোক কুমার, মনুসংহিতা (সদেশ) সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮ বিধান সরণী কলকাতা - ৬ শ্রীবলরাম প্রকাশনী : ১০০ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬, দ্বিতীয় পরির্জিত প্রকাশ : (শুভ ১লা বৈশাখ ১৪২৬)

২। শর্ম্মা, শ্রী পূর্ণচন্দ্র (সংকলিত), পাতঞ্জল দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা : দ্বিতীয় মুদ্রণ (মে, ২০০৫)

৩। স্বামী বাসুদেবানন্দ, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, কলকাতা - ৭০০০৬৭, উদ্বোধন কার্যালয়, সংস্করণ, ২০১৬

জীবন যোগের উপকারিতা

সাথী মন্ডল
সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী

কথায় আছে স্বাস্থ্যই সম্পদ। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মানুষ নিজেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে সচেষ্ট, এরই কারণে যোগের উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত "যুজ্" ধাতুর সহিত "ঘঞ্" প্রত্যয় যুক্ত হয়ে "যোগ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ও শারীরিক সুস্থতাকে গতিশীল রাখতে আজ থেকে প্রায় পাঁচবছর আগে সাধকেরা যোগব্যায়াম উদ্ভাবন করেন। ব্যুৎপত্তিগতভাবে যোগ শব্দটির অর্থ হল মিলন অর্থাৎ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মেলবন্ধন। বর্তমান বিশ্ব সংসারে যোগ হল এমন একটা পদ্ধতি যা আমাদের এই মনুষ্য সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে - 'যে সময় মানুষ তার সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করেন সেই সময় তার চিত্তে যে লয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা হল যোগ'। আবার এটাও বলা হয় যে আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ করার নাম যোগ। নিয়মিত যোগ অভ্যাসের ফলে লাভ হয় জ্ঞান। তাছাড়াও যোগের মাধ্যমে জন্মে চিত্তের একাগ্রতা। যোগভিত্তিক দর্শন আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত জরুরী।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের সকলের আছে। স্বাস্থ্য হল নিজের শরীর অর্থাৎ দেহ বা চিত্তে সুস্থতা সম্পর্কে ধারণা। কোনও ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকলেই তাকে স্বাস্থ্যবান বলে মনে করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে এক আধ্যাত্মিক এবং কঠিন তপস্যার পদ্ধতির হিসাবই সাধারণভাবে যোগের পরিচিত। সাধারণ ধ্যান, শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন ধরনের দেহভঙ্গিমা সহ কিছু যোগ স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানসিক চাপ হালকা করার জন্য অনুশীলন করা হয়। নিয়মিত যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সহিষ্ণুতা বাড়ে।

বর্তমানে যোগ চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যোগের প্রতি বিশ্বের সকল মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। বিশ্বজুড়ে যোগের প্রতি এই সর্বজনীন আকর্ষণকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ২১শে জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। আধুনিক বিশ্বে দ্রুত শিল্পায়ন তথা নগরায়ণের ফলে মানব জীবনের জটিলতা বেড়েছে, সঙ্গে দূষণ বেড়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মানসিক চাপ ও পীড়ন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষ ছুটে চলেছে। পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাবে এখন মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।

মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সুন্দর মনই একমাত্র ওষুধ। যা সৎ চিন্তার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। সুস্থ শরীরে শুদ্ধ চিন্তার বাসা বাঁধে। চিকিৎসকেরা বলেন সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মল বায়ু, সুষম আহার এবং পর্যাপ্ত ব্যায়াম অপরিহার্য। যোগ ব্যায়ামের দ্বারা আমরা আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে পারি। অন্যথা আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে, মনও ব্যাথা বেদনায় অস্থির হয়ে উঠবে। যোগ ব্যায়ামে একটা মানসিক আনন্দ থাকে এতে আমরা আমাদের দেহের কল-কবজাগুলি বশে রাখতে সক্ষম হয়। ফলে দেহে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আর তখনই আমরা সামগ্রিক জীবনযাত্রার যোগের সুফল লাভ করে থাকি। সাঁতার কাটা একটি চিত্তবিনোদন ও চমৎকার যোগব্যায়াম, সুস্থ থাকতে জগিং বা ধীরে ধীরে দৌড়ানো একটু সুন্দর ব্যায়াম। এতে আমাদের হৃদয় ও ফুসফুস সবল হয়। কর্ম ক্ষমতা বাড়ে দেহের সন্ধি-পেশী ইত্যাদি আরো সবল হয়। জগিং করলে দেহের উপরের অংশ নিতম্ব, উদর ও উরুদেশ সুদৃঢ়ই হয়। ব্যায়ামের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসও ঠিকঠাকভাবে নেওয়া দরকার। এছাড়াও আমাদের নিত্য জীবন যাপনে দাঁড়ানো, হাঁটা, শোওয়া, বসা সবকিছুতেই একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিমা আছে। সেটিও যোগ। এর সঠিক অনুকরণে মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর অন্যথায় মেরুদণ্ডের বিকৃতি ঘটতে পারে, দেহের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। কোনও ব্যক্তির সঠিক ভঙ্গি আর সোজা টানটান দাঁড়ানো এবং চওড়া কাঁধ দেখালেই বোঝা যায় তার প্রাণশক্তির পরিপূর্ণতা। আমাদের সবসময় দুপায়ে সমান ভর দিয়ে চলাফেরা করা উচিৎ আর বেঁকে দাঁড়ানো, বুক সামনের দিক দিয়ে হাঁটা, দুটি হাত প্যান্টের পকেটে রেখে চলা একদমই উচিৎ নয় আবার পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে সোজা হয়ে বসা উচিৎ। এর ফলস্বরূপ দীর্ঘক্ষণ লেখাপড়ায় কোনও ক্লান্তি বোধ হয় না। আসলে বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে আমাদের অঙ্গভঙ্গি এমন হওয়া উচিৎ যা আমাদের কর্মতৎপরতা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে সহায়ক হয়। অন্যথায় বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কোমরে ব্যাথা, শিরদাঁড়া ব্যথা, শরীর বেঁকে যাওয়া, হাঁপানি ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হবে।

আমাদের জীবনে ধ্যান বা মেডিটেশন-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ডাক্তারি পরীক্ষাই এবং বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গেছে যে ধ্যান করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের সুসামঞ্জস্য আসে, রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়, মানসিক চাপ কমে, দুর্বলতা দূর হয়। দৈনন্দিন জীবনে নানা ব্যস্তময়তার কারণে মানুষ চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে গেছে তাই মনকে শান্ত করার জন্য নিয়মিত ধ্যান অভ্যাস করা উচিৎ। ধ্যানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। যেমন - নদী সমুদ্রে প্রবেশ করলে তখন সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে পড়ে, সদৃশ প্রবাহ হয়ে পড়ে। ঠিক ধ্যানের সময় সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের স্মরণ না করে সেই অন্তর্যামী ব্রহ্মের আনন্দময়, জ্যোতির্ময়, ও শান্তিময় স্বরূপে মগ্ন হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ধ্যান। কেবলমাত্র পরিণত

ব্যক্তিরাই যে ধ্যানের দ্বারা উপকৃত হবে তা কিন্তু নয়, ছাত্র ছাত্রীরাও ধ্যানের অভ্যাসের দ্বারা লাভবান হবে।

যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে থাকি 'মহর্ষি পতঞ্জলির পাতঞ্জল যোগদর্শনে' খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে পতঞ্জলি যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পতঞ্জলি বিভিন্ন সূত্র ধারায় যোগকে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন। তিনি তার যোগসূত্রে দর্শন ও যোগ শিক্ষার সারমর্ম জুগিয়েছেন। যা একটি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বর্ণিত। তিনি যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। যে পদ্ধতিতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে মন বুদ্ধি স্থির ও শান্ত হয়ে সমাধি অবস্থা লাভ করে, ফলে আত্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। কিন্তু ইচ্ছা করলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায় না। যোগ শাস্ত্রকারের মতে চিত্ত শুদ্ধ, শান্ত ও স্থিরীকৃত করে, আত্ম উপলব্ধির অচেতন অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য আটটি সোপানের নির্দেশ দিয়েছেন। তার এই যোগসাধনার সূত্রগুলিকে 'অষ্টাঙ্গযোগ' বলা হয়। যোগসূত্রে বলা হয়েছে - "যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি"। মহর্ষি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগের অঙ্গ বা সাধনগুলি হল - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। এগুলি দেহের প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ তারা সবাই একই দেহশিক্ষার অন্তর্গত ও প্রতিটি অপরিহার্য।

বর্তমানে বহু মানুষ যোগকে কেবলমাত্র আসন বা যোগের শারীরিক অনুশীলন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু আসন শুধু ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক সুস্থতা বাড়ানো বিবিধ উপায়ের অন্যতম। কিন্তু পতঞ্জলি সচেতনা, আত্মিক বিকাশের জন্য পূর্বে উল্লিখিত ৮টি পন্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই আটটি পন্থা একত্রিত হয়ে একটি অর্থবহ ও উদ্দেশ্য সাধক জীবনযাপনের জন্য নৈতিক মূলমন্ত্র প্রস্তুত করেছে। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের গুরুত্ব মানব জীবনের উপর পরিলক্ষিত হয়। কারণ এই যোগের মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রগতি এবং সর্বোপরি আপন সত্তার বিকাশ। তাই বর্তমান জীবনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন গঠনে এবং মানবসভ্যতাকে উন্নততর জীবনচর্চার দিশা দেখাতে অষ্টাঙ্গিকযোগের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য - তা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে, নানা প্রতিষ্ঠানে এমনকি বাড়িতেও যোগচর্চা নিয়মিত অনুশীলন হয়ে আসছে।

অষ্টাঙ্গিকযোগের প্রথম ধাপ হল 'যম'। বৃক্ষের প্রধানমূল গুরুত্বপূর্ণ, অষ্টাঙ্গযোগের যমও সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ। মানবমনের চঞ্চলতার মূল কারণ হল আশা আকাঙ্ক্ষা। যম হল সেই আশা আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণের উপায়। বর্তমান যুগে ছাত্রজীবনে যথাযথ চরিত্র গঠনের সাধন হিসেবে যম এই যোগের উপর গুরুত্ব বাড়ছে।

দ্বিতীয় ধাপ হল 'নিয়ম'। নিয়ম হল ধর্মীয় প্রতিপালন করা। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা মূল যেমন গুরুত্বপূর্ণ অষ্টাঙ্গযোগের নিয়মও আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় নিয়ম হল ব্যক্তিজীবনে অনুসরণযোগ্য পাঁচটি নির্দেশ।

তৃতীয় ধাপ হল 'আসন'। আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল কর্মঠ করতে সাহায্য করে আসেন। কেবল শরীরকে সুস্থ রাখতে নয় মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য আসন অভ্যাস করা প্রয়োজন।

চতুর্থ ধাপ হল 'প্রাণায়াম'। নিয়মিত আসন অভ্যাসে শরীর ও মন প্রাণায়াম অভ্যাসের উপযোগী হয়। প্রাণবায়ু ও অপ্রাণবায়ুকে যখন আমরা আমাদের ইচ্ছামতো গ্রহণ করি বা ত্যাগ করি তখন তাকে প্রাণায়াম বলে।

'প্রত্যাহার' হল জ্ঞানেন্দ্রিয় সঙ্গম। ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে এনে চিত্তের অনুগত করাই হল প্রত্যাহার। আমাদের কর্তব্য প্রাণায়াম সিদ্ধা হয়ে আমিত্বের শক্তি দ্বারা বিষয় থেকে মনকে মুক্ত করে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা নিয়মিত প্রত্যাহার সাধন অভ্যাস করা।

ধারণাকে বৃক্ষের কুঁড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে। পঞ্চযোগাঙ্গের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ও চিত্ত শুদ্ধি ঘটলে চিত্তকে নাসিকাগ্র, ভূমধ্য, নাভিচক্র, জিহ্বাগ্র স্থাপন করাকেই 'ধারণা' বলা হয়।

ধ্যান একধরনের অনুশীলন যার দ্বারা মন স্থির ও শীতল হয়।

'সমাধি' হল শেষ ধাপ। এর অর্থ সম্মোহ। ধ্যান যখন ধ্যেয়ের স্বভাবের আবেশে জ্ঞানাত্মক স্বভাবশূন্য হয় তখন তাকে সমাধি বলে। শাস্ত্র একাত্ম অবস্থাকেই সমাধি বলা হয়েছে। এই অবস্থায় পাপ, পুণ্য, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি থেকে মানবাত্মা মুক্তি লাভ করে থাকে।

আর একটি যোগ সম্বন্ধেও বর্ণনা করা যেতে পারে। যার অভ্যাসের ফলে অতি সহজেই মনস্থির হয়, লাভ হয় নানাবিধ শক্তি। এটি অভ্যাস করাও সহজ। স্থিরভাবে সুখাসনে বসে ধাতু কিংবা প্রস্তর নির্মিত কোন দ্রব্যের উপর লক্ষ্য রেখে দৃষ্টি রাখতে হবে, সেই সময় যেন শরীর না নড়ে, মন বিচলিত না হয়। এরূপ ততক্ষণ অভ্যাস করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত চক্ষু দিয়ে জল পড়ে। বহুবার অভ্যাসের ফলে অনেক সময় এরূপ চেয়ে থাকার ক্ষমতা জন্মাবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্ব আজ মারণ ব্যাধির সম্মুখীন। সেই ব্যাধিটি Covid-19 (করোনা)। প্রতিনিয়তই করোনা সংক্রমণ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে গৃহবন্দী মানুষ আজ শারীরিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মুখে মাস্ক ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে চলেছে মানুষ, তথাপি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও ভারতীয় আয়ুশ মন্ত্রকের অবদানে ও আহ্বান প্রত্যেকের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলতে

জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই এই নিশ্চয়তা প্রত্যেককে শরীরচর্চা, যোগধ্যান, প্রাণায়ামে সামিল হতে হবে। সম্প্রতি অ্যাপল, গুগল, নাইকে যোগধ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাজের জায়গায় মেডিটেশন রুমে ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করেছেন। এতে কর্মচারীরা আরও মানসিকভাবে সবল হয়ে কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। প্রাচীনকালে বাল্যাশ্রমে ও গুরুর কাছে শিক্ষা লাভের পাশাপাশি যোগচর্চা উপাসনা শিখতে হত। ভারতকে তাই বলা হয় যোগের পীঠস্থান। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের এক উজ্জ্বল সহাবস্থান। সমস্ত যোগাসনকেই মনে করা হয় এক অর্থবহ জীবনধারণের একমাত্র অব্যর্থ উপায়। ভারত সরকারের যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা অনুসন্ধান পরিষদ বিদ্যালয়ে যোগশিক্ষা চালু করার সুপারিশ করেন। ফলে ছেলে মেয়েরা উপকৃত হন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগশিক্ষার গুরুত্ব আরও বাড়ানো দরকার।

বর্তমান সময়ে করোনা সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বসে থাকা অনলাইনে শিক্ষা নিতে থাকা ছাত্র ছাত্রীদের যোগাসনচর্চা মানসিক অবসাদ কাটাতে সাহায্য করবে। অভিভাবকগণ এতে কিছুটা চিন্তা মুক্ত হবেন।

শুধুমাত্র যোগাসন করে স্থায়ী কোনও উপকার হয় না। তাই যোগকে বাহ্যিক ভাবে না রেখে বিচার করে যোগের গভীরে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে হবে সাধনার মধ্য দিয়ে। তবেই যোগের আসল মাহাত্ম্য বোঝা যাবে। প্রকৃতপক্ষে যোগ হল এমন এক পদ্ধতি যার দ্বারা একটি লক্ষ্যে পৌঁছাতে মনকে শুধু চিন্তায় সমর্পিত করলে হয় না, দেহভঙ্গির দ্বারা শরীরকে স্থির লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হয় যাতে করে শরীর, মন ও বুদ্ধিকে একত্রিত করে চিন্তার লক্ষ্যমূলে পৌঁছানো সম্ভব। যোগকে বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে যোগ হল শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক বিকাশ তথা উত্তরণের এক সনাতন বিজ্ঞান।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। পাতঞ্জল দর্শন, শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ (সংকলক ও অনুবাদক), ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলকাতা, ১২৯১

২। যোগদর্শন - মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত, গীতাপ্রেস ১৪১৫ (একবিংশ সংস্করণ)

৩। সরল যোগ সাধন, পূর্ণান্দ ব্রহ্মচারী, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ)

৪। যোগশাস্ত্র, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনূদিত), কলকাতা ১৯৫৬

আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ।
নাস্ত্যদ্যমসমো বন্ধুঃ কৃত্বা সং নাবসীদতি।।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে কালিদাসের "প্রকৃতি চেতনা"

সুস্মিতা পোদ্দার
সংস্কৃতবিভাগীয় তৃতীয় সত্রের ছাত্রী

প্রকৃতি ও জীবজগৎ একই বিশ্ববিবর্তনের দু'টি বিচিত্র প্রকাশ। মানবসমাজকে নিয়ে এই জীবজগৎ। এই কারণে বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্য সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কাব্য কল্পনায় এই সম্বন্ধটি ধরা পড়েছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রকৃতিকে সচেতন জীবরূপে দেখার জন্য Wordsworth 'Poet of Nature' বা প্রকৃতির কবি আখ্যা পেয়েছেন, সেইরূপ একই কারণে ভারতবর্ষেও কালিদাসকে 'প্রকৃতির কবি' রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে অমর কবি কালিদাসের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও অনবদ্য নিসর্গপ্রেমের প্রতিফলন দেখা যায়।

কালিদাসকে যে কেন প্রকৃতির কবি বলা হয় তা তাঁর যে কোন কাব্য বা নাটক পড়লেই অনুধাবন করা যায়। ঋতুসংহার, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবম্, মেঘদূত, বিক্রোমোর্বশীয়ম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ --- সর্বত্রই তাঁর প্রকৃতি প্রেমের, প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার অনুভূতির পরিচয় মেলে। সমগ্র ঋতুসংহার ঋতুবৈচিত্রের সঙ্গে মানব জীবনেও যে বৈচিত্র্য আসে তার কাব্যিক প্রকাশ। রঘুবংশেও ফেনিল সমুদ্র, সবুজ বনরাজি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় এবং সেই সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গে নায়ক-নায়িকার প্রেম লীলার তুলনায়, অকারণ লোকাপবাদে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সময় জাহ্নবী গঙ্গার নিষেধ করার প্রচেষ্টা বর্ণনায়, সীতার দুঃখে বনের পশুপাখীরও করুণ অবস্থা বর্ণনায়, কুমারসম্ভবে হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য উন্মোচনে, অকাল বসন্তের আবির্ভাব- বর্ণনায়, মেঘদূত কাব্যে যক্ষের অচেতন মেঘকে দৌত্য নিযুক্ত করার, নদ-নদীর বর্ণনায়, নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার তুলনায়, অলকার অলৌকিক রূপ বর্ণনায় এবং অনুরূপ অসংখ্য ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় মেলে। তাঁর সৃষ্ট 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেও নিসর্গপ্রীতির অনুপম নিদর্শন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের শকুন্তলা প্রবন্ধে বলেছেন –

"অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে অনুসূয়া- প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। ... প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্যসাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।"

নাটকের প্রথমাঙ্ক আরম্ভ হয়েছে গভীর অরণ্যে রাজা দুষ্যন্তের মৃগয়া দৃশ্যের সঙ্গে। রাজা রথে বসে মৃগের পশ্চাৎ ধাবন করেছেন। হরিণটিও শরপতনের আশঙ্কা করে দ্রুত লাফ দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এখানে কবি --- "যদা লোকে সূক্ষ্মং ব্রজন্তি সহসা... কিংবা গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ" ইত্যাদি শ্লোক দুটিতে অনুপম মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির গতিশীল দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। কণ্ব তপোবনে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শান্ত তপোবনের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। আশ্রমের চারপাশে বড় বড় গাছ, গাছের নীচে নীবার ধান্য, গাছের কোটরে শুকপাখীদের নীড় তপোবন পরিবেশে আজন্মলালিত হরিণগুলির নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান – অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

তারপর দুষ্যন্ত লতাকুঞ্জের প্রেয়সীর সাথে মিলিত হয়ে তাকে আনন্দ দান করেছেন। কবিকল্পনা সমৃদ্ধ প্রকৃতির এরূপ রমণীয় পরিবেশে নায়ক-নায়িকার মিলন খুব কম কবিই ঘটিয়েছেন। চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলাতে প্রকৃতির এবং প্রকৃতিতে শকুন্তলার যে প্রগাঢ় স্নেহ অনুরাগ ছিল তা যেন পতিগৃহে যাত্রার উদ্দেশ্যে তপোবন থেকে কণ্ব দুহিতার বিদায় গ্রহণকালে কবির লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে শকুন্তলা আভরণপ্রিয়া হলেও গাছ থেকে পাতা ফুল ছিঁড়তো না, সেই শকুন্তলার প্রস্থানকালে কণ্ব তরুলতা ও পশুপাখীর কাছে অনুজ্ঞা চেয়েছেন – "অনুমতাগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।"

শকুন্তলার আসন্ন বিরহশোকে সমগ্র তপোবন ব্যাকুল। ময়ূর নৃত্য বন্ধ করেছে। মৃগের মুখ থেকে অর্ধচর্বিত ঘাস মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। বৃক্ষ থেকে শীর্ণ পাতা ঝরে পড়ছে। মৃগশাবক শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরে টেনেছে – এর দ্বারা তরুলতা, পশুপক্ষী সবকিছুর সঙ্গে মানব সমাজের অন্তর্গূঢ় যোগসূত্রটি অভিব্যক্ত হয়েছে। "বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। " (রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা)।

তৃতীয়াঙ্কে বেতসবনের দৃঢ়রক্ষণে স্থিত লতাকুঞ্জের স্নিগ্ধ শীতল মৃণাল সমাচ্ছিত শিলাতলে অনুরাগপীড়িতা শকুন্তলাকে শায়িত রাখা হয়েছে। প্রিয়সখীর শরীরসন্তাপ দূর করার জন্য অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা জলসিক্ত পদ্মপত্রের দ্বারা তাকে বীজন করেছে। শকুন্তলার মনোগত অভিপ্রায় জানানোর জন্য পদ্মপত্রের উপর নখ দিয়ে প্রণয়পত্র রচিত হয়েছে- তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি...।

প্রথমেই তপোবন পালিতা শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে জলসিঞ্চন করতে দেখা যায়। পবনে আন্দোলিত কেশরবৃক্ষের পাতাকে দেখে শকুন্তলা প্রিয়জনের আহ্বান বলে মনে করেন। সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শকুন্তলার অনুরাগ গভীর। তাই তিনি নবমল্লিকার নাম দেন বনজ্যোৎস্না।

তাছাড়া গাছে জল দেওয়া কেবল কর্তব্য পালনের তাগিদেই নয়, সেগুলির প্রতি শকুন্তলার স্নেহ বিদ্যমান – 'ন কেবলং তাতনিয়োগ এব অস্তি মে সোদরস্নেহঽপি এতেষু'।

একটি ভ্রমর শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলনের ব্যবস্থা করেছে। কারণ এই ভ্রমরের হাত থেকেই বাঁচানোর জন্য রাজার আবির্ভাব। দ্বিতীয়াঙ্কে আশ্রমের বাইরে রাজা যেখানে শিবির স্থাপন করেছেন সেখানেও একটি বৃক্ষছায়াশীতল শিলাসন আছে, এর দ্বারা রাজার মনও স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরে উঠবে-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় – 'সাম্প্রতম্ এতস্মিন্ পাদচ্ছায়াবিরচিতবিতানসনাথে শিলাতলে নিষীদতু ভবান্।'

পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চম অঙ্কের শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানের রুক্ষ পরিবেশেও 'পান্ডুপত্রাণাং তপোধনানাং মধ্যে কিসলয়মিব' শকুন্তলার বর্ণনায় প্রকৃতির স্পর্শ অনুভূত হয়। শকুন্তলা যে প্রকৃতির কত একাত্ম তা আমরা বুঝি পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টায় রত শকুন্তলার বর্ণিত এক কাহিনীতে। একদিন শকুন্তলা এবং রাজা দুষ্যন্ত যখন নবমালিকাকুঞ্জে নিভৃতমিলনের সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন জলপানে উদ্যত রাজার কাছে একটি হরিণশাবক এসে উপস্থিত হয়। হরিণশাবককে তৃষ্ণার্ত বুঝে রাজা করুণাবশতঃ তাকে জল খাওয়ানোর জন্য কাছে ডাকলেও সে এলনা। কিন্তু শকুন্তলা তাকে ডাকতেই সে এল এবং নির্ভয়ে জল পান করলো। তখন রাজা মন্তব্য করেছিলেন – "দ্বাবপত্র আরণ্যকৌ"

অর্থাৎ তোমরা দুজনেই বনের বাসিন্দা। শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার এই মন্তব্যও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ বহন করেছে। এছাড়াও তপোবনবাসী বল্কলধারী দুই কণ্ব শিষ্যের মধ্যে শকুন্তলাকে দু'টি বিশুষ্ক পত্রের মধ্যবর্তী নবোদ্গত কিশলয়ের মত দেখাচ্ছিল – 'মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্।'

মধুপান করতে ইচ্ছা থাকায় ভ্রমণ হিমগর্ভ কুন্দ কুসুমের ভিতরে বসতেও পারে না, আবার ত্যাগ করে যেতেও পারে না। ঠিক সেইরকম শাপপ্রভাবে বিস্মৃতচিত্ত রাজাও শকুন্তলাকে অন্তর্বতফনী দেখে গ্রহণও করতে পারলেন না, আবার ত্যাগ করতেও পারলেন না। বস্তুতঃ পঞ্চমাঙ্কে হস্তিনাপুরের কৃত্রিম নাগরিকতার পরিবেশে থাকিলেও তরুপুষ্প পক্ষীর নাম সন্নিবেশিত করে কবি কালিদাস রমণীয় প্রাকৃতিক উপস্থিতির সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। ষষ্ঠাঙ্কে প্রমোদবনে বসন্ত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিন্তু প্রেয়সীকে প্রত্যাখ্যান জনিত অনুতাপে ক্লিষ্ট রাজার চিত্তে বসন্ত প্রকৃতির আনন্দ বিকাশ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। যেমন – আম্রমুকুল প্রস্ফুটিত হলেও তাতে পরাগের প্রকাশ নেই। কুরবক কুসুম মুকুলের অবস্থাতেই রয়ে গেছে। শীত চলে গেলেও কোকিলের কণ্ঠে কুহুস্বর সম্পূর্ণ ধ্বনিত হচ্ছে না। অর্থাৎ বসন্তের প্রণয়ানুরাগ যেন থেমে গেছে।

সপ্তমাঙ্কে দুষ্যন্ত মেঘের স্তরের মধ্য দিয়ে স্বর্গ থেকে ফিরছেন। পথে মারীচের আশ্রমে মন্দার বৃক্ষের শ্রেণী, অশোক তরু প্রভৃতির অপূর্ব স্বর্গীয় শোভা ও প্রশান্তির নিদর্শন বিরাজিত। এর ফলে দুষ্যন্ত শকুন্তলার স্নিগ্ধ মিলনপর্ব সূচিত হয়েছে।

প্রতিটি অঙ্কেই প্রকৃতিপ্রিয় কবি লতাপাতা ও ফুলের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় আখ্যানের সূত্রটিকে পরিচালিত করে নাটকটিকে এক সুন্দর মালার আকারে সাজিয়েছেন। প্রকৃতির বহুবিচিত্র সত্তার মধ্যে এই মিলন সূত্রটি রয়েছে বলেই একটির দুঃখ শোকে অপরটি সমব্যথী হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে নিসর্গের এই যোগসূত্রটি কবিভাবনায় ধরা পড়েছে বলেই অজস্র প্রকার প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে মনুষ্য ঘটনাবহুল নাটকীয় আখ্যানের পৌবাপর্বটি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে সমগ্র নাটকই (প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের যে কোন সৃষ্টিই) প্রকৃতির সঙ্গে মানবজগতের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পটভূমিকায় রচিত এবং লালিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে – "শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদন্ড। ...দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না- দুষ্মন্ত, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, কণ্ব, গৌতমী, সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক মনে হয়।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিপ্রেমিক মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে তাকে দিয়ে নাটকের এত কার্যসাধন করিয়েছেন এবং মানবের সাথে প্রকৃতির এমন এক আত্মিক সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। চক্রবর্তী, শ্রী সত্যনারায়ণ, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কোলকাতা – ৭০০০০৬, ১৯৮৮ (২০০৮)

২। অধ্যাপক ড. মুখোপাধ্যায় গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১, কলেজ রো, কোলকাতা -৯, শুভ রথযাত্রা, ১৪১৯ (১লা বৈশাখ, ১৪২৬)

৩। ড. বসু অখিলচন্দ্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণি, কোলকাতা, ৭০০০০৬

অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের চিকিৎসাজ্ঞান

অয়ন্তিকা ঘোষ
সংস্কৃতবিভাগীয় ষষ্ঠ সত্রের ছাত্রী

অথর্ববেদ, (সংস্কৃত, অথর্ববেদ, অর্থবন্ ও বেদ শব্দের সমষ্টি) হল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের চতুর্থ ভাগ। 'অথর্ববেদ' শব্দটি সংস্কৃত অর্থবন্ (দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী) ও বেদ (জ্ঞান) শব্দদুটির সমষ্টি। অথর্ববেদ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তীকালীন সংযোজন। অথর্ববেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ২০ টি খন্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৭৩০টি স্তোত্র ও প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে।

অথর্ববেদকে অনেক সময় 'জাদুমন্ত্রের বেদ' বলা হয়। তবে অন্যান্য গবেষকরা এই অভিধাটিকে সঠিক নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। অথর্ববেদের সংহিতা অংশটি সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে উদীয়মান জাদুমন্ত্রমূলক ধর্মীয় রাজতন্ত্রনীতিগুলির প্রতিফলন। কুসংস্কার আশঙ্কা ও দৈত্যদানব কর্তৃক আনীত অমঙ্গল এবং ভেষজ ও প্রাকৃতিক মিশ্রণ থেকে উৎপন্ন ঔষধের কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কেনথ্ জিস্কের মতে অথর্ববেদ ধর্মীয় ঔষধ চিকিৎসাবিদ্যার বিবর্তন-এর প্রাচীনতম নথিগুলির অন্যতম আজও পাওয়া যায়। তার মতে অথর্ববেদ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের লোকচিকিৎসার আদি রূপটি প্রকাশ করেছে।

অথর্ববেদে ভেষজ বিজ্ঞান বা আয়ুর্বেদ-এর কথা উল্লেখ আছে। 'আয়ু' শব্দের অর্থ 'জীবন' এবং 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা বিদ্যা 'আয়ুর্বেদ' শব্দের অর্থ জীবনবিজ্ঞান বা জীববিদ্যা। অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের কল্যাণ হয় তাকে আয়ুর্বেদ বা জীববিদ্যা বলা হয়। আয়ুর্বেদ বলতে ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তাকে বোঝানো হয়। এই চিকিৎসা ৫০০০ বছরের পুরাতন। পবিত্র বেদ এর একটি ভাগ- অথর্ববেদ-এর যে অংশে চিকিৎসা বর্ণিত আছে তা-ই আয়ুর্বেদ। আদি যুগে গাছপালার সাহায্যে রোগীকে চিকিৎসা করা হত। বর্তমান 'হারবেল চিকিৎসা' তথা 'অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতে বেশ প্রচলিত। পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও এই চিকিৎসা বেশ প্রচলিত। কারণ মডার্ন এলোপ্যাথি অনেক ঔষধেরই Side effect বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমন : ঔষধ – সিপ্রোফ্লক্রসিন, ফ্লুক্লক্রসিলিন, মেট্রোনিজজল, ক্লক্রসিলিন প্রভৃতি ঔষধ রোগ সারানোর পাশাপাশি মানুষের শরীরের অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। আরোগ্য বিদ্যার মূল কথাই হলো যে সেটাই সঠিক চিকিৎসা যা রোগীকে সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয় এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্য রক্ষা ও তার উন্নতি, রোগরোধ ও তার সঠিক নিরাময়।

আয়ুর্বেদের মতে মানব দেহের চারটি মূল উপাদান হলো দোষ, ধাতু, মূল এবং অগ্নি। আয়ুর্বেদ এগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এগুলিকে 'মূলসিদ্ধান্ত' বা 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল তত্ত্ব' বলা হয়।

দোষ --- দোষ এর তিনটি মৌলিক উপাদান হল বাত, পিত্ত এবং কফ। যেগুলি সব একসাথে শরীরের ক্যাটাবোলিক ও অ্যানাবোলিক রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি দোষগুলির প্রধান কাজ হল শরীরের হজম হওয়া পুষ্টির উপজাত দ্রব্য শরীরের সমস্ত স্থানে পৌঁছে কোষ পেশী ইত্যাদি তৈরিতে সাহায্য করা।

ধাতু – ধাতু হল যা মানব দেহটিকে বহন করে। আমাদের দেহে সাতটি টিস্যু সিস্টেম আছে, যথা – রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ঋতু দেহের প্রধান পুষ্টি যোগায় এবং মানসিক বৃদ্ধি ও গঠনে সাহায্য করে।

মল – মল অর্থাৎ শরীরের নোংরা বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা। এটা হল শরীরের ত্রয়ীর মধ্যে দোষ ও ঋতু ছাড়া তৃতীয়।

অগ্নি – শরীরের সমস্ত রাসায়নিক ও পাক সংক্রান্ত কাজ হয় অগ্নি নামক দৈহিক আগুনের সাহায্যে একে বলা হয় অগ্নি।

আয়ুর্বেদে দৈহিক গঠনে বলা হয়েছে, জীবনকে ভাবা হয় দেহ, অনুভূতি, মন এবং আত্মার সমন্বয়। জীবিত মানব দেহ হল এই সব উপাদান যেমন তিন দোষ (ভাটা, পিত্ত এবং কফ), সাতটি প্রাথমিক টিস্যু (রস, রক্ত, মনসা, মেজ, অস্থি, মজ্জা এবং শক্র) বা ঋতু, মল বা ঘাম – এসবের এক একত্রীভবন। দেহের বৃদ্ধি ও পরন পুরোটাই নির্ভর খাদ্যের উপর যা দোষ, ঋতু ও মল-এ পরিবর্তিত হচ্ছে। হজম প্রক্রিয়া, শোষণ, পরিপাক দোষ, ঋতু ও মল এ পরিবর্তিত হচ্ছে। হজম প্রক্রিয়া, শোষণ, পরিপাক প্রণালী ও খাদ্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর আমাদের স্বাস্থ্য ও ব্যাধি নির্ভর করে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মানব দেহের সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমাদের দেহে উপস্থিত উপাদানগুলির ভারসাম্য ও শারীরিক স্থিতির উপর। শরীরের অন্তর্নিহিত বা বাহ্যিক বিভিন্ন কারণের জন্য এই প্রয়োজনীয় ভারসাম্যে তারতম্য আসতে পারে। যার ফলে অসুখ আসতে পারে এই ভারসাম্যের অভাব ঘটতে পারে। আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ভুলের জন্য বা ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাপন বা দৈনিক জীবনে কু-অভ্যাসের জন্য। ঋতু অস্বাভাবিক, ভুল ব্যায়াম বা ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং দেহ মনের অমিলপূর্ণ ব্যবহারও দেহ ও মনের ভারসাম্যের বিঘ্নতা ঘটায়। চিকিৎসা হল সঠিক খাদ্য, সুজীবনযাত্রা ও স্বভাবের উন্নতির দ্বারা শরীর ও মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা, ঔষধ গ্রহণ, বিরাম, পঞ্চকর্ম এবং রসায়ন চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় সম্ভব।

রোগ নির্ণয়-এ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলেছে – আয়ুর্বেদে রোগীর শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণ অবস্থার বিচার করে তবেই রোগ নির্ণয় করা হয়। চিকিৎসক আরো কিছু বিষয়ে ধ্যান দেয়, যেমন রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, খাদ্যাভাব, হজমের ক্ষমতা, কোষ পেশি ও ঋতু ইত্যাদি কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু তিনি আরও অনুধাবন করেন, আক্রান্ত শারীরিক কোশগুলি এবং কলাগুলি ঋতু, কোন জায়গায় রোগস্থিত, রোগীর রোধক্ষমতা, প্রাণশক্তি, দৈনন্দিন রুটিন এবং রোগীর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষাও দরকার হয়—

- সাধারণভাবে শারীরিক পরীক্ষা
- নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা
- মূত্র পরীক্ষা
- মল পরীক্ষা
- জিহ্বা ও চোখ পরীক্ষা
- চামড়া এবং কান পরীক্ষা, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় এর ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা

চিকিৎসা, সম্পর্কে বলা হয়েছে, আরোগ্য বিদ্যার মূল কথাই হল যে সেটাই সঠিক চিকিৎসা যা রোগীকে সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয় এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করেন। আয়ুর্বেদ-এর মূল উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যরক্ষা ও তার উন্নতি, রোগরোধ ও তার সঠিক নিরাময়।

চিকিৎসার প্রধান বিষয় হল শরীরের পঞ্চকর্মের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করে, তার রোধ করে পূর্বাবস্থায় ফেরানো। ঔষধ পুষ্টিকর খাদ্য, জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে শরীরে উপযুক্ত শক্তি যুগিয়ে এটা করা সম্ভব যাতে ভবিষ্যতেও রোগ প্রভাবিত করতে না পারে। রোগের চিকিৎসা সাধারণত সঠিক ঔষধ, খাদ্য ও উপযুক্ত ক্রিয়াকলয়াপ দ্বারা করা হয়। উক্ত তিনটির প্রয়োগ দুই রকমভাবে করা হয়। একটা পদ্ধতিতে উপায় তিনটি রোগের এটিওলোজিক্যাল বিষয়সমূহ এবং প্রকাশের বিরুদ্ধতা করে আক্রমণ করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ওষুধ, খাদ্য এবং ক্রিয়াকলাপকে ঐ তিনটি উপায়কেই এটিওলোজিক্যাল বিষয়সমূহ এবং প্রকাশের একই প্রভাবের জন্য লাগানো হয়। এই দুই ধরনকে বলা হয় ভিপ্রীত এবং ভিপ্রীতার্থকারী চিকিৎসা। সফল চিকিৎসা প্রদানের জন্য চারটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। ঐ গুলো হচ্ছে –

- ঔষধ
- পরিষেবিকা
- রোগী

গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম স্থান চিকিৎসকের। তার যথাযথ ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবিক বোধ ও শুদ্ধ মন অত্যন্ত জরুরি। তার চিকিৎসাবিদ্যাকে যথেষ্ট নম্রতা ও বিদগ্ধতার সাথে মানবজাতির কল্যাণে ব্যয় করা উচিৎ। খাদ্য ও ঔষধের গুরুত্ব এর পরেই আসে। এগুলি অতি উন্নতমানের সঠিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং সর্বসাধারণের জন্য, সর্বত্র পাওয়া উচিৎ। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের কে কবিরাজ বলা হয়।

আয়ুর্বেদ-এ চিকিৎসার ধরণসমূহ নানা প্রকার –

শোধন চিকিৎসা (বিশুদ্ধকরণ চিকিৎসা) এই চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি দূর করে চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের ভিতর ও বাহিরের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণ পদ্ধতিগুলি হল পঞ্চকর্ম বেমনকারক ঔষধ, বিরোচন, গুহ্যদেশ প্রক্ষিপ্ত তৈল ঔষধ, মলদ্বারে প্রবেশ করানো তরল ঔষধ এবং নাসিকার ঔষধ। পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজনীয় শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আরোগ্য আনা হয়। স্নায়ুরোগের জন্য অস্থি ও মাংসপেশীর অসুখে কিছু ধমনী ও স্নায়ু-ধমনী সংক্রান্ত অবস্থায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ও পচন প্রক্রিয়ার অসুখে এই চিকিৎসা বিশেষ উপযোগী।

শমন চিকিৎসা (প্রশমণকারী চিকিৎসা), এই চিকিৎসায় রোগ আক্রান্ত দোষগুলিকে দমন করা হয়। যে পদ্ধতিতে ‘দোষ’ বা শরীরের ভারসাম্য নষ্ট না করে পূর্ববস্থায় ফেরে তাকে শমন চিকিৎসা বলে। এই চিকিৎসায় রোগ উপশমকারী বেদনা নাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

পথ্য ব্যবস্থা (ক্রিয়াকলাপ এবং খাদ্যাভ্যাসের নিয়মাবলী), দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস শারীরিক ক্রিয়াকর্ম, অভ্যাস ও আবেগজনিত অবস্থা সংক্রান্ত উচিৎ অনুচিৎ বিষয়ে ইঙ্গিতসমূহ পথ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত। শেরপেটিক পরিমাপ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে এবং প্যাথোজেনিক প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করতে এই ব্যবস্থা চালু।

নিদান পরিবর্জন (অসুখ হওয়া ও অসুখের বৃদ্ধিকারক কারণগুলি বর্জন) – রোগগ্রস্ত হওয়ার যে সব কারণসমূহ দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় বর্তমান, সে গুলির পরিহার। যে সকল কারণে রোগগ্রস্ত শরীরে আরো রোগগ্রস্ত হতে পারে। সেকারণগুলিকে পরিত্যাগ করা।

সত্ত্ববজায় (মানসিক রোগের চিকিৎসা) প্রধানতঃ মানসিক অসুবিধায় বেশি কাজ করে। মনকে অস্বাস্থ্যকর বস্তুর কামনা থেকে মুক্ত রাখা, সাহস, স্মৃতিশক্তি, বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান চর্চা অনেক বিশদভাবে আয়ুর্বেদে বর্ণিত।

রসায়ন চিকিৎসা (অনাক্রম্যতা এবং পুনযৌবনপ্রাপ্তির ঔষধ) – মানবদেহে শক্তি ও প্রাণশক্তি আনয়নের চিকিৎসা। শারীরিক কাঠামোর দৃঢ়তা স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধি, বুদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যৌবনজ্যোতি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহে পূর্ণমাত্রায় শক্তি সংরক্ষণ – রসায়ন চিকিৎসার অন্যতম উপকারিতা।

চিকিৎসার প্রধান বিষয় হল শরীরের পঞ্চকর্মের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করে, তার রোধ করে পূর্বাবস্থায় ফেরানো। ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য, জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে শরীরে উপযুক্ত শক্তি যুগিয়ে এটা করা সম্ভব যাতে ভবিষ্যতেও রোগ প্রভাবিত করতে না পারে। রোগের চিকিৎসা সাধারণত সঠিক ঔষধ। খাদ্য ও উপযুক্ত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা করা হয়। উক্ত তিনটির প্রয়োগ দুই রকমভাবে করা হয়। একটা পদ্ধতিতে উপায় তিনটি রোগের এটিওলোজিক্যাল বিষয়সমূহ এবং প্রকাশের বিরুদ্ধতা করে আক্রমণ করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ওষুধ, খাদ্য এবং ক্রিয়াকলাপকে ঐ তিনটি উপায়কেই এটিওলজিক্যাল বিষয়সমূহ এবং প্রকাশের একই প্রভাবের জন্য লাগানো হয়। এই দুই ধরনকে বলা হয় ভিপ্রীত এবং ভিপ্রীতার্থকারী চিকিৎসা। সফল চিকিৎসা প্রদানের জন্য চারটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। ঐগুলো হচ্ছে, -

- ঔষধ
- পরিষেবিকা
- রোগী

গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম স্থান চিকিৎসকের। তার যথাযথ ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবিক মূল্যবোধ ও শুদ্ধমন অত্যন্ত জরুরি। তার চিকিৎসাবিদ্যাকে যথেষ্ট নম্রতা ও বিদগ্ধতার সাথে মানবজাতির কল্যাণে ব্যায় করা উচিৎ। খাদ্য ও ঔষধের গুরুত্ব এর পরেই আসে। এগুলি অতি উন্নতমানের, সঠিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং সর্বসাধারণের জন্য সর্বত্র পাওয়া উচিৎ। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের কে কবিরাজ বলা হয়।

আয়ুর্বেদ-এ চিকিৎসার ধরণসমূহ নানা প্রকার ---

শোধন চিকিৎসা (বিশুদ্ধকরণ চিকিৎসা) এই চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি দূর করে চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের ভিতর ও বাহিরের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণ পদ্ধতিগুলি পথ্য ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা – আয়ুর্বেদে চিকিৎসা হিসাবে খাদ্যাভ্যাসের নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানব দেহকে খাদ্যের ফলস্বরূপ ধরা হয়। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মন মেজাজ সবই তার খাদ্যের মানের উপর নির্ভরশীল। মানবদেহে খাদ্য প্রথমে ‘চাইল’ বা ‘রস’ এ পরিবর্তিত হয়। এবং তারপর যথাক্রমে বিভিন্ন প্রক্রিয়া

দ্বারা রক্ত, পেশী, চর্বি, হাড়, হাড়ের মজ্জা পুনর্জননের উপাদান এবং ওজাস-এ রূপান্তরিত হয়। কাজেই খাদ্য হল দেহের সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং জীবনী শক্তির মূল। খাদ্যে পুষ্টির অভাব বা বেঠিক রূপান্তর অনেক রকম রোগের অবস্থায় সৃষ্টি করে।

আয়ুর্বেদের ইতিহাসের দিকে তাকালে উৎস অনুযায়ী শনাক্ত করা যায় খ্রীঃ পূর্ব ৬০০০ অব্দে। তখন একটি মৌখিক রীতি হিসাবে এর উদ্ভব হয়েছিল। আয়ুর্বেদের কিছু ধারণাসমূহ সিন্ধু সভ্যতার সময়েও ছিল। আয়ুর্বেদ প্রথম নথিবদ্ধ আকার বিবর্তিত হয় বেদ থেকে। বৈদিক পরম্পরায় আয়ুর্বেদ হচ্ছে একটি উপবেদ (সহায়ক জ্ঞান)। অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের উৎস পাওয়া যায়। অথর্ববেদে আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ১১৪ টি স্তোত্র রয়েছে। আয়ুর্বেদের উদ্ভব নিয়ে বিভিন্ন কিংবদন্তী রয়েছে। যেমন, ধন্বন্তরী (বা দিবোদাস) ব্রহ্মার দ্বারা আয়ুর্বেদ লাভ করেন। এই কিংবদন্তিও প্রচলিত যে, অগ্নিবেশ মুনির হারিয়ে যাওয়া রচনার এর অবদানে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। বৈদিক এবং বেদোত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি, আচার্য শ্রীগঙ্গাধর মিশ্র, ডা: গৌরীশঙ্কর মিশ্র।
২। আয়ুর্বেদ কা ইতিহাস, ডা: দীপক যাদব প্রমচন্দ্র, প্রো. বমহর্ষ সিংহ।
৩। সুশ্রুত সঙ্ঘিতা, ডা: অনন্তরাম শর্মা, ডা: প্রিয়ব্রত শর্মা।

মনুষ্য জীবনে কর্মযোগের ভূমিকা

সীমা বিশ্বাস
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

'কর্মযোগঃ' অংশটি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুন 'গান্ডিব' ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে মানবজীবনের কর্ম ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন। মানবজীবনে কর্মের ভূমিকা কতখানি তা এই 'কর্মযোগ' অধ্যায়টিতে শ্রীকৃষ্ণ তার বাণী বিবৃত করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

"ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

এর আক্ষরিক অর্থ হল 'কর্মচেষ্টা না করলে মানুষ নৈষ্কর্ম্য বা মোক্ষলাভ করতে পারে না।" মানবজীবনের লক্ষ্য হল ঈশ্বর প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। তা কী ভাবে সম্ভব? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কর্তব্য কর্মে সর্বদা যুক্ত থাকা। কিন্তু কর্মে যুক্ত হলে ফলাকাঙ্ক্ষা মনে জেগে ওঠে। আসক্তি জাগে। আর আসক্তি থেকেই আসে দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তা হয় না। কর্মহীন হয়ে থাকলে বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে থাকলে মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয় না। তাহলে কী সন্ন্যাস মার্গ অবলম্বন করলে মোক্ষলাভ হবে? না তাতেও হয় না। আসলে মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজন অহংকার। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, কামহীন নিষ্কাম কর্ম। আর তাতেই ঘটে মোক্ষলাভ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

"ইন্দ্রিয়াথান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে"

'বিমূঢ়াত্মা' হল মূঢ়ামতি। মানুষ পার্থিব জগতে অজ্ঞানবশত সঠিক পথে না গিয়ে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে এবং সেই পথটিকেই আবার সঠিক বলে মনে করে। যারা এরূপ করে তারা প্রকৃত ভ্রান্তমতি।

মানুষ কর্মের অধীন। কর্ম ছাড়া মানুষ থাকে না। কর্মই আবার বন্ধন। তাই অনেকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে অবস্থান করে। কিন্তু তারা আবার মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে স্মরণ বা তা দিয়ে তারা রূপরসগন্ধ স্পর্শানুভূতির কথা ভাবে এটা এক অর্থে মিথ্যাচার

করা। কারণ বাইরে কর্মহীন থাকলেও অন্তরে কর্মফলাকাঙ্ক্ষার আসক্তি তীব্র থাকে। এতে কর্মবন্ধন মুক্ত তো হয়ই না বরং মিথ্যাচার করে পাপকেই আহ্বান জানায়। এরা এক অর্থে মিথ্যাচারী।

ভগবান বলেছেন –

"কার্যতেঽবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিত্যৈগুণৈঃ"

মানুষ কর্ম ছাড়া ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না। কারণ মানুষ প্রকৃতির গুণে অবশ বা বাধ্য হয়ে কর্ম করতে সচেষ্ট থাকে। মানুষ 'সত্ত্ব, রজ ও তম' এই তিন গুণে আবর্ত থাকে। এর ফলে রাগদ্বেষাদি যেমন জন্মায় তেমনি কর্মপ্রেরণা নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি স্বাভাবিক কর্মও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন সন্ন্যাসমার্গ মোক্ষলাভের একটা পথ হলেও তা ত্যাগ করে কর্মযোগ মার্গ অবলম্বন করা উচিৎ।

ভগবান বলেছেন –

'নিয়তং কুরু কর্ম'...

নিয়তকর্ম হল 'শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম' শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন কর্মশূন্য হয়ে থাকা ঠিক নয়। কর্মই শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া কর্ম না করলে দেহ মাত্রাও নির্বাহিত হয় না। শরীরের ধর্মই কর্মমুখর থাকা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

"স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ"

এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন-

অর্জুন তুমি ক্ষত্রিয়, তাই তোমার উচিৎ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করা আর সেটা হল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে স্বধর্ম পালনে রত হওয়া। তা ছাড়া পার্থিব জগতে মানব সমাজে প্রতি বর্ণ ও প্রতি আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত ধর্ম আছে আর সেটা হল মানুষের স্বধর্ম। ভগবান আরও বলেছেন – স্বধর্ম পালনে কিছুটা দোষযুক্ত হলেও সেটা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত করলে পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বধর্ম পালনেই মানুষের ব্যাপৃত থাকতে বলেছেন। তাতেই মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গল। তাই তো তিনি মানবকুলের স্বধর্ম রক্ষার জন্য বলেছেন যে, স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণ কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এর থেকেই বোঝা যায় যে কর্মই ধর্ম। কামনা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মে যুক্ত থাকলে মোক্ষলাভ ঘটে। তবে কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযম করে মনে মনে বিষয় চিন্তা করার অর্থ মিথ্যাচার করা। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদনই শ্রেষ্ঠ কর্ম। তা ছাড়া কর্মের মধ্য দিয়ে শরীর যাত্রার অর্থ দেহ সুস্থ রাখা। তাই

আসক্তি শূন্য থেকে সর্বদা কর্তব্য কর্মে যুক্ত থাকতে হবে। সেটাই মোক্ষপদ প্রাপ্তির উপায়। জনকাদি মহাত্মাগণ লোকরক্ষার জন্য কর্ম করে গিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণগুলিকেই সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তো ত্রিলোকে কোনও কর্তব্য নেই তবুও তিনি কর্মেই ব্যাপৃত কারণ মানুষ তো তাঁকেই অনুসরণ করবে। তিনি কর্মেই ব্যাপৃত কারণ মানুষ তো তাঁকেই অনুসরণ করবে। প্রতিটি মানুষের স্বধর্ম পালন করাই শ্রেষ্ঠ। আর মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে গেলে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাণী মেনে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্মে যুক্ত থাকতে হবে। তাতেই মানুষের মঙ্গল হবে এবং মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হবে। তাই আমাদের 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' এই 'কর্মযোগঃ' অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী কর্তৃক (অনুবাদকৃত), 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ' ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট 17th January, 2019.

২। শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', প্রেসিডেন্সী, কোলকাতা, 1917 খ্রিস্টাব্দ

৩। অনন্ত বিজয় দাশ, (সম্পাদক) যুক্ত পত্রিকা, ভগবদগীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য।

৪। ড. দেবকুমার দাস, 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', প্রকাশক – স্বদেশ, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – ১৪০৪

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্মাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃপাঃ।।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রামায়ণের প্রভাব

অন্নপূর্ণা স্যান্যাল
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতির মত রামায়ণও সনাতন ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছেন।

অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র জীবনকাহিনীই রামায়ণের মূল কাহিনী। রামায়ণের মোট ২৪ হাজারের অধিক শ্লোক আছে। সমস্ত রামায়ণ সাতটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগকে কান্ড বলে। এই সাতটি কান্ডের নাম -

১) আদিকান্ড, ২) অযোধ্যা কান্ড, ৩) অরণ্যকান্ড, ৪) সুন্দর কান্ড, ৫) কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড, ৬) লঙ্কা কান্ড ও ৭) উত্তর কান্ড।

রামায়ণের মূল কাহিনী -

আদিকান্ড : পুরাকালে অযোধ্যার বিখ্যাত সূর্যবংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তার ছিল তিন রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলে রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত। সুমিত্রার দুই ছেলে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন। মাতাপিতা ও রাজপুরীর অন্য সকলের আদর যত্নে চার ভাই বড় হতে থাকেন। রামচন্দ্র তার ভাইয়েরা তখন কিশোর। একদিন বিশ্বামিত্র ঋষি এলেন রামচন্দ্রকে তার আশ্রমে নিয়ে যেতে উদ্দেশ্য, মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, রামচন্দ্র তাদের প্রতিরোধ করে যজ্ঞ সম্পাদনের সহায়তা করবেন। রামের সাথে লক্ষণও গেলেন। রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করে রাম-লক্ষণ নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করে।

তখন মিথিলার রাজা জনকও একটি যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞ দর্শনের জন্য রাম লক্ষণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র মিথিলায় যান। সীতা নামে জনকের একটি কন্যা ছিল। তার বিবাহের জন্য একটি শর্ত আরোপ করে রেখেছিলেন রাজা জনক। জনক প্রাসাদে হর বা শিবের দেওয়া একটি ধনু ছিল। হরের দেওয়া ধনু বলে ধনুটির নাম হরধনু। যে ঐ হরধনুতে গুণ সংযোগ করতে পারবে, তার সাথে সীতার বিবাহ দেবেন। কিন্তু অনেক রাজা ধনুতে গুণ পরানো দূরে থাক, তুলতেই পারেনি, শক্তিধর রামচন্দ্র সেই ধনুকে গুণ তো সংযোগ করলেনি, এমন জোরে ধনুটি বাঁকালেন যে ধনুটিই ভেঙে গেল।

অযোধ্যার রাজা দশরথের কাছে সংবাদ পাঠানো হল। তিনি ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় এলেন। জনকের আর একটি কন্যা ছিল, তার নাম ঊর্মিলা। আর জনকের ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে ছিল।

একজনের নাম মান্ডবী, অপর জনের নাম শ্রুতকীর্তি। রামের সাথে সীতার, লক্ষণের সাথে ঊর্মিলার ভরতের সাথে মান্ডবীর এবং শত্রুঘ্ন-এর সাথে শ্রুতকীর্তির বিয়ে হল। রাজা দশরথ পরমানন্দে চার পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যা ফিরে এলেন।

অযোধ্যা কাণ্ড :

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে রামকে যুবরাজ রূপে অভিষিক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। সকলেই আনন্দিত হল। তখন কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র শত্রুঘ্ন সহ নিজ মাতুলালয়ে ছিলেন। কৈকেয়ীও আনন্দিত হলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর পিত্রালয় থেকে আগত দাসী মন্থরা তাকে কুমন্ত্রণা দিল। একসময়ে রাজা, দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। মন্থরা বলল, এই হচ্ছে ঐ বর দুটি চেয়ে নেওয়ার সঠিক সময়। এক বরে রাম চোদ্দ বছরের জন্য বনে যাবে। আর এক বরে ভরতকে যুবরাজ রূপে অভিষিক্ত করতে হবে। কৈকেয়ী প্রথমে মন্থরার কথায় সায় না দিলেও পরে সম্মত হলেন এবং দশরথের কাছে গেলেন। তার কথা শুনে দশরথ রাজা মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

রামের অমত সত্ত্বেও সীতা দেবী ও লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনে গেলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে রাম, লক্ষ্মণ সীতা চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে লাগলেন। এদিকে পুত্র শোকে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করলেন। ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেও রাম এলেন না। ভরত রামের পাদুকা নিয়ে এলেন এবং সেই পাদুকা সিংহাসনে রেখে সিংহাসনের পাশে বসে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

অরণ্য কাণ্ড :

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা প্রথমে চিত্রকূট পর্বতে পরে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখান থেকে যান পঞ্চবটীতে। ঘটনাচক্রে লঙ্কার রাজা রাবণ সেখান থেকে সীতা হরণ করে নিয়ে যায়।

কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড ও সুন্দর কাণ্ড :

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব এবং হনুমানের সহায়তায় রাম জানতে পারলেন, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে লঙ্কায় আটকে রেখেছে।

লঙ্কা কাণ্ড :

সুগ্রীবের রাজ্যে নল নামক একজন ব্যক্তি ছিল। সে সমুদ্রের ওপর ভাসমান সেতু নির্মাণ করল। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান সহ সুগ্রীবের সৈন্যরা সেই সেতু দিয়ে গিয়ে লঙ্কা অবরোধ করল। বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করার জন্য রাবণকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাবণ না শুনলেন না

সে বিভীষণকে তিরস্কার করল। বিভীষণ মনের দুঃখে রামের পক্ষে যোগ দিলেন। রাম-রাবণের প্রচন্ড যুদ্ধ হল। রাবণ পরাজিত ও নিহত হল। রাম, লক্ষণ ও সীতাসহ অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

উত্তর কাণ্ড :

ভরত রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে বনবাস দিলেন। সেখানে সীতার লব ও কুশ নামে সন্তানের জন্ম হয়। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি সীতা ও লবকুশকে নিয়ে উপস্থিত হন। সীতাকে আবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলা হয়। সীতা মনের দুঃখে পাতালে প্রবেশ করে। রামচন্দ্রও সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেন।

ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব অপরিসীম। এখনও হিন্দুদের ঘরে ঘরে রামায়ণ পঠিত হয়। আদর্শ রাজা, আদর্শ ভাই, প্রভৃতির চিত্র ও চরিত্র আজও জীবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হয়।

সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য সহ ভারতবর্ষের আরও অনেক ভাষার সাহিত্য রামায়ণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'নামক মহাকাব্য, হিন্দী কবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের কাহিনী রামায়ণ থেকে সংগৃহীত।

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যবর্তী ঠিক কোন সময়ে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে তার তথ্য ভিত্তিক প্রমাণ আজও অনাবিষ্কৃত। শুধু আয়তনে বিশাল নয়, বিষয় বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে উক্ত মহাকাব্য সমৃদ্ধ। রামায়ণ শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য নয়, আদিকবির আদি কাব্য রূপেও তা প্রসিদ্ধ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গৌরব এবং সৃষ্টির বিশালতায় এই মহাকাব্য আজও অনন্য। রামায়ণ যেন যুগ সঞ্চিত একটি জাতির হৃদয়াবেগ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মননশীলতার অফুরন্ত আধার। রামায়ণকে শুধু শুধু ধর্মীয় সাহিত্য বললে অবজ্ঞা করা হয়। সারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণ যুগে যুগে এই মহাকাব্য পড়েছে ও শুনেছে। পল্লীবাংলার কুটিরে, গ্রামে, জনপদে রামায়ণ গান গীত হচ্ছে এবং আজও হচ্ছে। রামায়ণ হল ক্রমবিকশিত অকৃত্রিম মহাকাব্যের নিদর্শন।

কালের প্রহরী এড়িয়ে জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ আজও অমলিন, অম্লান, অক্ষয়রূপে মর্যাদার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীর হৃদয়ে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন যুক্তি তথ্য ও মতবাদের ভিত্তিতে রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের সম্ভাব্য রচনাকাল নির্ণীত হলেও আদ্যাবধি গবেষণা বর্তমান।

রামায়ণ ভারতবর্ষের অমূল্যরত্ন। ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ বণিতার এই গ্রন্থের প্রতি সমান অনুরাগ। ভারতের কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ এবং বিদেশের মিলটন বা শেক্সপিয়ার এর রচনা

যতই উন্নতমানের বা ভাবগম্ভীর হোক না কেন তা রামায়ণ-এর মতো ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারেনি। আদিকবি বাল্মীকি রচিত এই মহাকাব্যকে আশ্রয় করে দেশী ও বিদেশী বহু মনিষী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উত্তররামচরিতে ভবভূতি শুধু বাল্মীকিকে আদিকবি বলেননি, কালিদাসও বাল্মীকিকেই আদিকবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই, রামায়ণ আদিকাব্য, বাল্মীকি আদিকবি। সেই আদি কবির আদিকাব্য, বাল্মীকি আদিকবি। সেই আদি কবির আদিকাব্য রামায়ণের রামকথা পরিচিত সীমা সুবিস্তৃত, কারণ স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তার বিপুল সম্বর্ধনা। রামায়ণের উৎসভূমি ভারতবর্ষ হলেও বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আপন ক্ষমতায়। এর আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক সত্ত্বা, অন্তরঙ্গের মনোহর দ্যোতনা সবকিছুই বিশ্বের সহৃদয় মানুষের হৃদয়ভূমিতে রয়েছে। যেখানে ধর্মে অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধ ও মুসলমান বা অহিন্দু সেখানে রামকথার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা অপরিসীম।

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বাল্মীকি আদিকবি আর তার রচিত রামায়ণ আদিকাব্যরূপে প্রসিদ্ধ যা হিন্দুদের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণের বেশ কয়েকটি নামান্তর ও দেখা যায়। যেমন – 'রামচরিত', সীতাচরিত', 'রঘুবংশচরিত', 'রঘুবীরচরিত', 'পৌলস্তবধ' ইত্যাদি। রামায়ণ ভারতীয়দের মহাকাব্য এবং ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্য ও ভারতের চিরন্তন ইতিহাস। বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী ও তার সুমহ্য চরিত্রগুলিকে এমন নিবিড়তায় আমাদের প্রাণের বস্তু করে তুলেছেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের আপামর জনসাধারণ তাতে চির-অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে। রামায়ণ একাধারে ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য এটি ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ – এই চতুর্বর্গের রত্নময় আধার মহাসমুদ্রের মতো তা গভীর শ্রুতিমনোহর ও হৃদয়নন্দন।

হিন্দুদের যে উচ্চাদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে যে শ্রেয় ধর্মের বিকাশ, মহাকবি বাল্মীকি আপন প্রতিভায় এবং অভিজ্ঞতার তুলিকায় সে সব মহান আদর্শকে রূপায়িত করে তুলেছেন। যে রূপায়ন অমলিন, অম্লান। রামায়ণের চরিত্রগুলি যেন ভারতীয় আদর্শেরই জীবন্ত বিগ্রহ। একথা যেমন বুঝতে হবে যে আলোর স্বরূপ বুঝতে যেমন অন্ধকারের ভূমিকা অপরিহার্য তেমনিই রাবণাদির পটভূমিকায় রাবণাদির ঔজ্জ্বল্য ও মহত্ত্ব বাল্মীকি তার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে আমাদের প্রাণের বস্তু করে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। শতাব্দীর পর আপন, ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে রামায়ণ পাঠের প্রচলন রামায়ণ প্রভাবেরই ফল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রামায়ণ এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে, আমরা নানা প্রবাদ প্রচলনে তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। লঙ্কা কাণ্ড করে বসা, ঘরশত্রু বিভীষণ, কালনেমীর লঙ্কা ভাগ, ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুতঃ রামায়ণ কাব্য উপাদানের এক অমেয় ভাণ্ডার। দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই রামায়ণের নির্বাধ গতি।

সমাজজীবনে প্রভাব :-

বাল্মীকি তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভাবলে রাম-সীতার মাহাত্ম্য ভাবের গভীরতায় এবং ভাসের প্রাঞ্জলতায় এমনই হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন যে, ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা তার দ্বারা চির অনুপ্রাণিত। রামের অসাধারণ মাতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের অতুলনীয় ভ্রাতৃভক্তি ও সীতার অনুপম পতিব্রত্য জনমানসকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগের মহিমায় এরা সকলেই স্বমহিমায় ভাস্বর। ক্ষমা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, প্রজা বাৎসল্য ও দৃপ্ত পুরুষাকারের জ্বলন্ত বিগ্রহ রামচন্দ্র। সীতাকুল শিরোমণি সীতা রমণীকুলের রত্নস্বরূপা। দশরথ ও কৌশল্যার মধ্যে আমরা স্নেহকাতর পিতামাতাকে পাই। আদর্শ প্রভুভক্ত হনুমান সকলের নমস্য। রামায়ণ যত না যুদ্ধকে আশ্রয় করে তার চেয়ে বেশি রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রেমকে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছে। ভারতীয়দের গার্হস্থ্য জীবন যে কত উচ্চস্থানে ছিল তা এই মহাকাব্য প্রমাণ করেছে।

ধর্মীয় জীবনে-এর প্রভাব :

ভারতীয় ধর্মজীবনেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের নরনারী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রাম, সীতা ও প্রভুভক্ত হনুমানের নাম জপ করে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, কোনো বারব্রতে, দেবালয়ে, সাধারণদের মিলনস্থানে রামায়ণ গান আজও পঠিত হয়। উত্তর ভারতে পরস্পরের সাক্ষাৎকারে "রাম রাম" উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছর 'দশেরা' উপলক্ষে রামোৎসব পালিত হয়।

সাহিত্যে প্রভাব :

রামায়ণ মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাব্য। অখিল ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্যের উৎস রামায়ণ মহাকাব্য।

ক) সংস্কৃত সাহিত্য :

প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসের প্রতিমা ও অভিষেক নাটক, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশম্, ভবভূতির মহাবীরচরিতম্ এবং উত্তররামচরিতম্, ভট্টির রাবণবধম্, কুমারদাসের জানকীহরণম্, মুরারীর অনর্ঘরাঘব, ভোজের চম্পূরামায়ণ – এই সুবিশাল সাহিত্যকৃতির উপাদান রামায়ণ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভূত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং আধুনিক কালের শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের কাব্য ও নাটক, শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের নাটকে রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্মণীয়।

খ) প্রাদেশিক সাহিত্য :

প্রাদেশিক সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, তোরবেয় রামায়ণ, অসমিয়া ভাষায় মাধব-কন্ডলীর রামায়ণ, তামিল ভাষায় কিম্বরামায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ) আধুনিক বাংলায় : ঈশ্বরচন্দ্রের সীতার বনবাস, মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য, রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি অসংখ্য সাহিত্য রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তরালে কিছু ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। এই রূপক কাব্য থেকে জানা যায় – সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসসভ্যতা ও বানরসভ্যতা বিস্তৃত ছিল। আর কৃষিই যে আর্যদের মূল সভ্যতা তা সীতা শব্দের মধ্যে পাই। এই কৃষিভিত্তিক সভ্যতা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে – এই কথা পাশ্চাত্য পন্ডিত ওয়েবার এবং ইয়াকোবিও স্বীকার করেন।

মানব সভ্যতা আজ দ্বিতীয় সহস্রাব্দে উপনীত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার আশীর্বাদপুষ্ট সভ্যতা এখন এক উত্তুঙ্গ ঐশ্বর্য্যের আঙিনায় বিরাজমান। তৎসত্ত্বেও রামায়ণে বর্ণিত তৎকালীন ভারতীয় সমাজের মানবিক আদর্শ, দাম্পত্য, প্রেম, ভ্রাতৃপ্রীতি, প্রভুভক্তি, গুরুশিষ্য সম্পর্ক, পারিবারিক আচার আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি এসবই আজকের সমাজের ভুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ জানতে চায়। সেই সকল আদর্শ আজও নিজেদের জীবন পথের দিশা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করে। ভারতীয় মহাকাব্যের নানা কাহিনী শুনে কখনো বা পড়ে সামাজিক জীবনকে চলিষ্ণু রাখার শিক্ষা লাভ করে। তাই তাদের জন্যই আজও রামায়ণ-মহাভারতের সমাজ জীবনের বিবিধ দিক আলোচনা মনে হয় প্রাসঙ্গিক। আধুনিকতা সমাজে জীবনের বাহ্যিক বাতাবরণ যত প্রাচুর্যই বহন করে আনুক তার অন্তর দিককে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে রামায়ণে বর্ণিত সমাজ জীবন চর্চার প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে বাস করে তখনই জন্ম হয় সমাজের। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সমাজ জীবনে। সমাজের মানুষ যত উন্নত মননশীলতা ও সভ্যতার ধারক সেই সমাজ তত উন্নত বলে স্বীকৃত। রামায়ণের সভ্যতা বেদ অনুসারী। তবু কালিক ব্যবধান হেতু রামায়ণের সামাজিক আচার আচরণ ও রীতিনীতিতে কিছু পরিবর্তন সামাজিক আচার আচরণ ও রীতিনীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

বৈদিক যুগের মতই মহাভারত রামায়ণের যুগে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। পরিবারের বন্ধন বজায় থাকতো স্বামীর, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা ভক্তি, স্নেহ প্রীতির দ্বারা, রামায়ণে আদর্শ পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে রয়েছে স্বামীর পতিব্রতা স্ত্রীর আনুগত্য, পিতা মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি, ভ্রাতাদের মধ্যে নিবিড় স্নেহের বন্ধন। অবশ্য রাজা দশরথের পত্নী থাকার সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কোনও পত্নীর পুত্র অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকারী, অবশ্য পিতার আদেশ, ইচ্ছা বা পূর্ব প্রতিশ্রুতি পরিবারস্থ সকলের নিকট শেষ কথা ছিল। দশরথ কৈকেয়ীকে তার ইচ্ছা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলেই, তার পুত্র ভরতকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতে হয়। পিতৃসত্য পালনের জন্য অগ্র মহিষী কৌশল্যা নন্দন জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্র সিংহাসনে

তার ন্যায্য দাবি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বনবাসকে সানন্দে মেনে নিলেন। দশরথের পুত্র স্নেহের প্রকাশ ঘটলো, রাম বনে গেলে তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। উল্লেখযোগ্য সীতা; লক্ষ্মণের রামের অনুগমন। মিথিলার রাজকন্যা, অযোধ্যার রাজকূলবধূ সীতা পতিব্রতা পত্নীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখলেন স্বামীর সঙ্গে বনবাসী হয়ে। অযোধ্যার রাজকুমার লক্ষণ তার ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় দিলেন স্বেচ্ছায় বনবাসে রামের অনুগমন করে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের প্রতি অবিচার হয়েছিল বলে, ক্ষুব্ধ হয়ে ভরত তার মায়ের প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছেন এবং রামের বনবাস কালে তার পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন পরিচালনা করেছেন। প্রতিটি দৃষ্টান্ত একটি আদর্শ পরিবারের চিত্র উদ্ভাসিত করে।

রামায়ণ পাঠ করলে আমাদের অন্তর পবিত্র হয়। উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে রামায়ণ আমাদের সামনে ধর্মের দর্শন ও সুমহান আদর্শ তুলে ধরেছে।

রামায়ণ মহাকাব্যের অন্তরালে কিছু ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। এই রূপক কাব্য থেকে জানা যায়—সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসসভ্যতা ও বানর সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। আর কৃষিই যে আর্যদের মূল সভ্যতা তা সীতা শব্দের মধ্যে পাই। এই কৃষিভিত্তিক সভ্যতা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই কথা পাশ্চাত্য পন্ডিত ওয়েবার এবং ইয়াকোবি ও স্বীকার করেন।

ভারতের সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, ধর্ম সর্বত্রই রামায়ণের অসীম প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রহ্মার আশীর্বাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

‘যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।’

গ্রন্থপঞ্জী :

১। বাল্মীকি রামায়ণ (প্রথম খন্ড) – সুভাষ ভট্টাচার্য

২। কৃত্তিবাস ও বাংলা রামায়ণ – অমিয়শঙ্কর চৌধুরী

৩। ছেলেদের রামায়ণ – উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৪। রামায়ণ সপ্ত কাণ্ডে সম্পূর্ণ – অনুবাদক পন্ডিত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী প্রকাশক – শ্রীবেণীমাধব সরকার

ছেলেদের রামায়ণ – প্রকাশনী – নালন্দা

বাল্মীকি রামায়ণ – বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। (প্রথম খন্ড)

৫। বাল্মীকি রামায়ণ – তারাকান্ত কাব্যতীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত- পি. এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রা. লিমিটেড কলকাতা

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে কালিদাসের প্রকৃতি চেতনা

রিয়া রায়
সংস্কৃতবিভাগীয় প্রথম সত্রের ছাত্রী

মানব সমাজ বিশ্ব প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই মানুষের সাথে প্রকৃতির রয়েছে এক অন্তরঙ্গ যোগসূত্র। আত্মার আত্মীয়তা। এই দার্শনিক সত্যিই বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের মনে ছিল সর্বদাই অনুপ্রাণিত। (তাই সকল সাহিত্যেরই দেখা যায় এক অনুপম প্রকৃতির প্রতি।) সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রথে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রকৃতির সাথে মানুষের যে নিবিড় আত্মীয়তার চিত্র দেখা যায়, তার তুলনা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের কোথাও মেলেনা প্রস্তাবনাতেই রয়েছে সূত্র অথবা রাজন বীরের মুখে অন্যটির সংগীতের গ্রীষ্ম। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের অপূর্ব বর্ণনা। ("সুভগসলিলাবগাহা:.....।। "এবং ঈষদীষ চুম্বতানি...."।।)

প্রথম অংকের প্রথমাংশে দেখি প্রাণ ভয়ে দ্রুতগতি চিত্র আর ধাবমান সঙ্গে অভিরাম অপরূপ চিত্র আর তার পশ্চাতে ধাবমান রাজা দুষ্মন্তের রথাশ্বগণের ঊর্ধ্ব কর্ণ নিষ্পন্ন চামরশিখা নিরায়ত পূর্বকায়ের অপূর্ব বর্ণনা। হরিণটি দ্রুতগতির রাজাকে তার অপরূপ বৃন্দ থেকে দূরে এনে ফেলেছে কণ্ব তপোবন এবং তার ফলেই ঘটেছে তার শকুন্তলার দর্শন ও পারস্পরিক অনুরাগের উদ্ভব। এটাই এই নাটকের বীজ এই বীজ বপনে তাই প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার এই বীজের অঙ্কুরোদগম অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বিকাশেও উদ্দীপন বিভাব রূপে তপোবন প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আশ্রমের চারাগাছ গুলির আলবালে জলসেচনরতা নবযৌবনা শকুন্তলা রাজার চোখে পুষ্পভরা লতার সঙ্গে অভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছে। শকুন্তলা কেবল পিতার নির্দেশেই জলসেচন করে না। চারাগাছ ফুলের প্রতি রয়েছে তার অকৃত্রিম সোদরস্নেহ। তাই সে বলেছে _ "অস্থি মে সোদরস্নেহঽপি এতেষু"। বকুল চারাটি তাকে পাতার আঙুল নেড়ে তার কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে বলে। নবমল্লিকা লতা বনজোৎস্না শকুন্তলার ভগিনী। পদ্মিনী রমণী শকুন্তলার মুখে বারবার বসতে গিয়ে একটি ভ্রমর রাজার আত্মপ্রকাশের সাহায্য করে। আবার দূরান্তের অনুচরদের রথদর্শনের এক বর্ণনায় প্রবেশ করে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের কারণ হয়ে রসান্তর ঘটিয়েছে (সম্ভোগ শৃঙ্গার থেকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার)।

দ্বিতীয় অংকের রাজার বিদূষক এর সাথে শকুন্তলার বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন বৃক্ষ তলে বসে।

তৃতীয় অংকেও মালিনী নদীর তীরে স্নিগ্ধশীতল বেতস লতা কুঞ্জে ঘটেছে নায়ক নায়িকার মিলন। শকুন্তলা সেখানে পুষ্পশয্যায় শায়িত এবং পদ্মের পাতায় এবং বাতাস এর সাহায্যে সখিরা তার

শরীরের সন্তাপ নিবারণে ব্যাপৃত। শকুন্তলার প্রেমপত্র লেখা হলো পদ্মপাতায় নখের আচড়ে। চতুর্থ অংকে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির তরুলতা। পশুপক্ষী সবকিছুর সাথেই মানবসমাজের আত্মিক যোগসূত্রটি অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা কালে তপোবনের প্রকৃতি তাকে অকৃপণ হস্তে দান করেছেন নানা বসন ভূষণ। কর্ণ মুনির কাছে আশ্রম তরুণরাও অন্য মানুষের মতোই তপোবন পরিবারের সদস্য। তাই তাদের কাছেও তিনি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুভূতি প্রার্থনা করছেন। তপোবন প্রকৃতিরও প্রথমে অসময়ে কোকিলের কুহু রবের মাধ্যমে এবং পরে সুস্পষ্ট আকাশবাণীর আশীর্বাদে তার যাত্রা অনুমোদন করেছে। আর্য পুত্র দর্শনের সমুৎসুক হলেও তপোবন ছেড়ে যেতে শকুন্তলার পা সরছে না। আবার তার আসন্ন বিচ্ছেদে তপোবন প্রকৃতির বেদনা বিহ্বল- "উৎগলিতদর্ভকবলা মৃগ্য পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ। অপসৃত পান্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূনীব লতাঃ"। প্রকৃতির সাথে মানবের এমন সুগভীর আত্মীয়তার বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যের সুদুর্লভ।

পঞ্চম অংকে হস্তিনাপুরের নগর। পরিবেশ ও তপস্বী পরিবৃত্ত শকুন্তলা দুচোখে যেন ছিন্নপত্ররাজির মধ্যে লাবণ্য কিশলয়। হরিণ শিশুকে পত্রপুটে জলপান করাবার গল্প বললে শকুন্তলা দুষ্যন্তের স্মৃতি জাগাতে চেষ্টা করেছে।

(ষষ্ঠ অংকে দেখি স্মৃতি ফিরে পাওয়া অনুতাপকৃষ্ট মহারাজ দুষ্মন্তের আদেশে বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ করায় আমের মঞ্জুরি ফলে পরিণত হয়নি, বসন্তের কোকিল নীরব রয়েছে।)

সপ্তম অংকে নায়ক-নায়িকার অন্তর স্বর্গীয় প্রেমে স্থানীয় মিলন ঘটেছে। স্বর্গ তপোবনের এক অপরূপ স্বর্গীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই প্রকৃতিপ্রেমিক মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে তাকে দিয়ে নাটকের এত কার্য সাধন করিয়েছেন এবং মানবের সাথে প্রকৃতির এমন এক আত্মীয় সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন, বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। কালিদাস সত্যিই প্রকৃতির কবি।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৭।

২। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, অনিলচন্দ্র বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৯৫।

৩। বসু, চন্দ্রনাথ শকুন্তলাতত্ত্ব, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৯৯৬।

মেকি খেলা

রাজীব সিন্‌হা
সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপক

পৃথিবীর এই মেকি খেলায়
কেন যে আমি একটি ভেলায়।
ভেলায় যখন ভাসতে থাকি
জীবন দেখি অনেক বাকি।
স্বপ্নে মোড়া জীবন খানি
জলের ঢেউয়ে আরো রঙিন।
ভ্রষ্ট পথে পাবার নেশা
পূর্ণ কি হবে মনের আশা।
মেকির মুখোশ দেখবো ভাবি
মনে তখন অজ্ঞানতার চাবি।
বেঁচে থাকার রসদ কোথায়
স্বপ্ন পথে বড্ড জাগায়।
চশমা চোখে বিশ্ব দেখি
সত্য জ্ঞানে সবেই মেকি।
সময় কখন দূরে চলে
ভেলা যে আমার প্রতিকূলে।
মিথ্যে আশায় দূরে তাকায়
মহাকালই স্বপ্ন ভাঙ্গায়।।

জীবন

রাজীব সিন্‌হা
সংস্কৃতবিভাগীয় অধ্যাপক

পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছো তুমি রাজপথে
প্রাণ ভরা চাওনি দিয়ে ভিক্ষে দিলে আমার পাতে।
স্বপ্ন ভরা জীবন নিয়ে ভেসে চলো আকাশ পথে
নুন আনতে পান্তা ফুরায় স্বপ্ন আমার নয়ন পথে।
অন্ধ চোখে চশমা পরে রঙিন দেখো জগৎটাকে-
দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে ঘাটে।
না চাওয়াতেই রত্ন আসে জীবন চলে নদীর স্রোতে।
বাঁচার আশায় স্বপ্ন দেখি, সুখ যে আসে মধ্যরাতে।
মরীচিকার জলের মতো, সর্বনেশায় মত্ত থাকো
পেটের দায়ে কর্ম নিয়ে, দুঃখে চড়ে জীবন ভাসে।।
কষ্ট ভরা জীবন ফাঁকি, মনের কথা শুধুই বাকি।
বুদ্ধি আমার শিকেয় তোলা, মৃত্যু আমার জীবন তালা।।

তোমার তরে

অমিত কুমার মণ্ডল

জোয়ার ভাঁটার জীবনমাঝে,
আসবে বাঁধা নতুন কত
পর্ণমোচীর পাতার মতো-ই,
ঝড়বে অশ্রু শতো শতো।।
আসবে জেনো ঝড়ো হাওয়া, আসবে যে তুফান।
তারি-ই মাঝে দাঁড়িয়ে থেকো,হয়োনা ম্রিয়মাণ।।
আবার তুমি চলতে শেখো, স্বপ্ন নতুন দেখে।
ভেঙে যাওয়া স্বপ্নটিকে জীবনমাঝে রেখে।।
ফেলে আসা জীবন পানে,
আর চেওনা এমন করে।
হার মেনোনা, এই তো আমি,
দাঁড়িয়ে আছি তোমার তরে।।

তীব্র যন্ত্রণা তীব্র বেদনা
আনবে জীবনে চরমাঘাত।
মিত্ররূপী শত্রু-ও জেনো
করবে তোমায় আত্মসাৎ।।
কামমোহিনী শিরায় শিরায়, উঠবে জেগে প্রলুব্ধ হয়ে
ক্রোধাদি রিপুর তুষানলে, অন্তর-ও যাবে দগ্ধ হয়ে।।
লক্ষ্যে স্থির,অবিচল হৃদে, তবু-ও থেকো প্রজ্জ্বলিত।
কামক্রোধাদির বিনাশে, তব জীবন হবে উদ্দীপিত।
জীবনদ্যুতির আলোকশিখা
উঠবে জ্বলে নতুন করে
হার মেনোনা, এই তো আমি
দাঁড়িয়ে আছি তোমার তরে।।

হৃদয়ভেদী শত যাতনা,
সহন কর অনন্তকাল।
দুর্বিপাকময় জীবনচক্রে,
আসেই আসুক মহাকাল।।

প্রবৃত্তিরূপী কীটানু তখন, করুক না তমে জর্জরিত।
সত্য সুন্দরের আলোকশিখায়, হৃদয় রেখো উদ্ভাসিত।।
দেখবে তখন মহাশক্তি,
উঠবে জেগে তোমার মাঝে।
হার মেনোনা এই তো আমি,
দাঁড়িয়ে আছি তোমার তরে।।

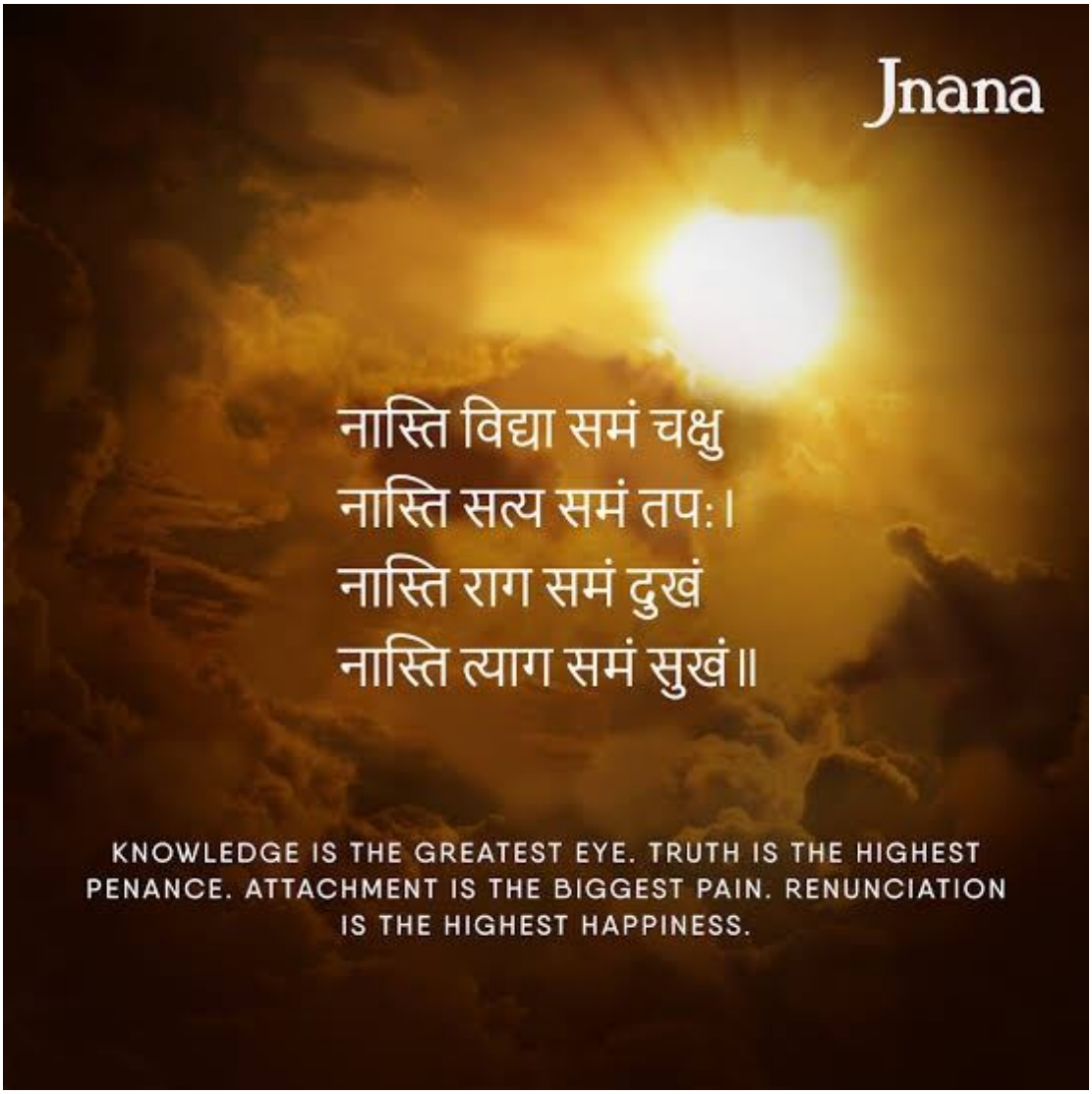

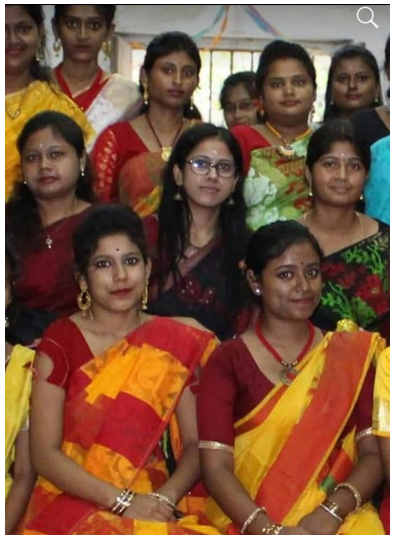

শিক্ষকদিবস অনুষ্ঠানে আমরা সংস্কৃত পরিবার।।

সংস্কৃতদিবস উদ্‌যাপনে আমরা সবাই

7 days TEXT-READING INTERNATIONAL E- WORKSHOP
On
" TARKĀMṚITAM" (तर्कामृतम्) by Jagadīśa Tarkālaṃkāra Bhattāchārya
Organized by: Department of Sanskrit, Hijli College (Affiliated to Vidyasagar University)
Hijli Co-Operative, Paschim Medinipur, West Bengal-721306, India.
In Collaboration with :
Department of Sanskrit, Srikrishna College, Bagula, Nadia, West Bengal - 741502, India.
and
Department of Sanskrit, Chakdaha College, Chakdaha , Nadia, West Bengal - 741222, India.
ABOUT THE WORKSHOP :
मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिम्।
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते किमिहोपकारम् ।।
" Tarkāmṛitam" is a treatise in Sanskrit giving a foundational exposition of the ancient Indian system of logic and reasoning. " Tarkāmṛitam" by Jagadīsh Tarkālankār Nyaya philosopher and sanskrit scholar from Navadwip in the 16th century. Jagadīsh Tarkālankār's ancestors were originally from sylhet. His father, Jadavchandra Vidyavagish, was a nyaya scholar at Navadwip and his great-grandfather, Sanatan Mishra, was the father-in-law of Sri chaitanya. Jagadīsh was taught nyaya scriptures at Bhavananda's chatuspathi (religious school), where he became well-versed in nyaya philosophy and was awarded the title of 'Tarkālamkār'.
Jagadish Tarkalankar was a college teacher. Mayukh, Jagadīsh's annotation of raghunath shiromani's Tattvachinta-manididhiti is a four volume discourse: Pratyaksamayukh, Anumanmayukh, Upamanmukh and Shabdamayukh. He also wrote Anumandidhititika, Pratyaksadidhititika and Lilavatidid-hititika, annotations on Shiromani's didhiti.
Jagadīsh's Shabdashaktiprakashika was once taught as a textbook at all chatuspathi in Bengal. Two of his other books are Tarkāmṛitam and Nyayadarshan. He was awarded the title of 'Jagadguru' for his scholarship.
आदौ जगा जगु पश्चज्जगाजगुरतः परम्।
अधुना ज्ञानपरम्परा जगदीशयते जग॥
In indian philosophical writings, the traditional structure of presenting a system consisted of three things: uddesa (listing of items to be discussed), laksana (defining each item in the list) and pariksa (critically examining whether the definitions apply properly to the items defined). The Tarkāmṛi-tam follows this model except for the third item of pariksa. The text presents the ontology, logic and epistemology of the Nyaya-Vaiseshika system.
"न्यायमधीते सर्वस्तनुते कुतुकान्निबन्धमप्यत्र।
अस्य तु किमपि रहस्यं केचन विज्ञातुमीशते सुधियः"॥
Platform :
StreamYard
YouTube
Programme Schedule :
DATE- 21st - 27th September, 2020.
TIME - 3.30 p.m. - 6.00 p.m.
(Everyday)

CHIEF PATRON

Dr. Asis Kumar Dandapat
Hon'ble Principal,
Hijli College .

PATRON

Dr. Swagata Das Mohanta
Hon'ble Principal,
Chakdaha College.

PATRON

Dr. Sukdeb Ghosh
Hon'ble Principal,
Srikrishna College.

INVITATION TO THE E-WORKSHOP

Dear Participants,

It's our pleasure to inform you that the Department of Sanskrit , Hijli College (Affiliated to Vidyasagar University), Hijli Co-Operative, Paschim Medinipur, West Bengal-721306, India, is going to organize a 7 days TEXT-READING INTERNATIONAL E-WORKSHOP On "TARKAMRITAM" on and from 21/09/2020 to 27/09/2020. In collaboration with Srikrishna College (Affiliated to University of Kalyani), Bagula, Nadia,West Bengal-741502, India and Chakdaha College (Affiliated to University of Kalyani), Chakdaha, Nadia,West Bengal - 741222, India. In this occassion we cordially invite you to attend this seven days International E-workshop.

WHO CAN ATTEND :

The E- Workshop is open to Faculty Members (regular/ad-hoc/temporary) from any Indian University/College, registered M.Phil/Ph.D. research scholars, PG student and UG student. All the participants are requested to register online by visiting our brochure before September 20th, 2020. Registration is mandatory for all the participants. For further queries, please e-mail us in hcsanskritdepartment17@gmail.com

E-WORKSHOP RULES :

1. The E-Workshop begins on September 21st, 2020.
2. Details of the programme will be sent to the participants later.
3. Face book & YouTube link will be sent via mail/WhatsApp Group before starting of the Webinar.
4. The participants can join live in YouTube or in Face book.
5. All participants have to send online feedback through chatbox for each session as per guidelines.
6. E – Certificate will be given to the registered participants after successful completion of the event and feedback form submission.
7. Participants should attend 90% for getting eligibility to obtain the E-certificate.
8. The organizing committee will give prime importance to willing and serious participants although the E-workshop is being conducted through online mode. In this context, it is also noted that the E-certificates will be awarded only to those participants who will be present each and every online session and of the E-workshop.

EMINENT GUESTS AND INVITED SPEAKERS:

Inaugural Session :

Date - 21/09/2020

Time : 3.30 p.m. - 6.30 p.m.

Inaugural Address:

Prof. Dr. Gopalchandra Misra
Professor, Department of Sanskrit,
Rabindra Bharati University, India.
Former Hon'ble Vice Chancellor,
University of Gour Banga, India.

Chief Guest:

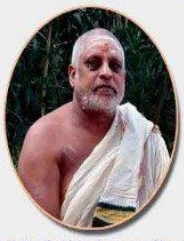

Prof. Dr. Gabbita Anjaneya Shastri
Professor, Dept. of Vedic Darshan,
Varanasi, B.H.U., India.

Guest of Honors:

Special Guest:

Prof. Dr. V. Venkatraman
Professor, Dept. of Nyaya and Vaisheshika,
Karnataka Sanskrit University, India.

Special Guest:

Prof. Dr. Tapan Shankar Bhattachariya
Professor, Dept. of Sanskrit,
Jadavpur University, Jadavpur, India

Technical Session: Date-22/09/2020-26/09/2020 Time: 3.30p.m.-5.30p.m.

Speakers for Text Interpretation:

Prof. Dr. Bishnupada Mahapatra
Professor, Dept. of Nyaya, Sri Lal Bahadur Shastri
National Sanskrit University, Delhi. India.

Dr. Jayamanikya Shastri
Associate Professor, Dept. of Nyaya
S.J.S.V, Puri, India.

Valedictory Session : Date-27/09/2020 Time: 3.30p.m.-6.30p.m.

Valedictory Address:

Prof. Dr. Piyus Kanti Dixit
Professor,Dept. of Nyaya Darshan, SLBSRSV,New Delhi, India.
Former Hon'ble Vice Chancellor,
Uttrakhand Sanskrit University. India.

Chief Guest:

Prof. Dr. Kamalesh Mishra
Former Professor, Dept. of Nyaya, S.S.J.V.,
Puri, India.

Guest of Honor:

Prof. Sarbani Ganguli
Former Professor, Dept. of Sanskrit,
Jadavpur University, Jadavpur, India.

Special Guest:

Prof. Dr. Agnieszka Rostalska
Lecturer for Theoretical and
Comparative Philosophy
Universtteit Leiden, Netherland.

PROGRAMME SCHEDULE (Tentative)

Inaugural Session

Day /Date	Time (3.30-6.30 pm)	Programme & Speaker
Day 1 21.09.2020	3.30 -3.35 pm	Mangalācharanam by : Namita saha
	3.35 – 3.40 pm	Introduction :
	3.40 – 3.45 pm	Welcome Address by : Dr. Asis Kumar Dandapat
	3.45 – 3.50 pm	Special Address by :Dr. Sukdeb Ghosh
	3.50 – 3.55 pm	Special Address by :Dr. Swagata Das Mohanta
	3.55 – 4.15 pm	Inaugural Speech by : Prof. Dr. Gopalchandra Misra
	4.15 – 5.15 pm	Chief Guest Address by: Prof. Dr. G. Anjaneya Shastri
	5.15 – 5.50pm	Special Address by : Prof. Dr. V. Venkatraman
	5.50 – 6.20pm	Special Lecture by : Prof. Dr. Tapan Shankar Bhattachariya
	6.20 – 6.25 pm	Vote of Thanks by : Dr. Shiladitya Satpathi
	6.25 – 6.30 pm	Madhurāgītam by : Latika Das
Session Co-Ordinator : Asit Kumar Sau Co – Ordinator : Rajib Sinha		

Technical Session

Day /Date	Time (3.30-6.00 pm)	Programme & Speaker
Day 02 to Day 06 (22.09.2020 - 26.09.2020)	3.30 – 3.35 pm	Mangalācharanam : Goutam Maitra
	3.35 – 3.40 pm	Introduction :
	3.40 – 5.10 pm	Text Interpretor : Prof. Dr. Bishnupada Mahapatra
	5.10 – 5.15 pm	Madhurgitam : Shreya Basu
	5.15 – 5.45 pm	Text Interpretor : Dr. G.Jayamanikya Shastri
	5.45 – 5.50 pm	Shāntipāt : Debarpita Banerjee
	5.50 -6.00 pm	Question Answer Session :
Session Co-Ordinator : Asit Kumar Sau, Rajib Sinha, Dr. Shiladitya Sathpathi, Dr. Dipankar Parui, Goutam Maitra, Subhranil Manna, Ranu Kolya		

Valedictory Session

Day /Date	Time (3.30-6.30 pm)	Programme & Speaker
Day 07 27.09.2020	3.30 – 3.35 pm	Mangalācharanam :
	3.35 – 3.40 pm	Introduction :
	3.40 – 3.45 pm	Welcome Address by : Dr. Asis Kumar Dandapat
	3.45 – 4.30 pm	Valedictory address by : Prof. Dr.Piyus Kanti Dixit
	4.30 – 5.10 pm	Chief Guest Address by :Prof. Dr. Kamalesh Mishra
	5.10 – 5.40 pm	Special Guest Address by :Prof. Dr. Sarbani Ganguli
	5.40 – 6.10 pm	Special Guest Address by :Prof. Dr. Agnieszka Rostalaska
	6.10 – 6.20 pm	Feedback by the Participants :
	6.20 – 6.25 pm	Vote Of Thanks by : Dr. Sudip Kumar Das
	6.25 – 6.30 pm	Madhurāgītam : Latika Das
Session Co – Ordinators : Asit Kumar Sau, Rajib Sinha, Dr. Shiladity Satpati		

MEMBERS OF THE STEERING COMMITTEE

CONVENOR

Mr. Asit Kumar Sau ,
Assistant Professor & Head,
Department of Sanskrit,
Hijli College .

CO-CONVENOR

Dr. Shiladitya Satpathi
Assistant Professor,
Department of Sanskrit,
Chakdaha College.

ORGANIZING-SECRETARY

Mr.Rajib Sinha
Assistant Professor & Head,
Department of Sanskrit,
Srikrishna College.

PROGRAMME CO-ORDINATORS

Dr. Sudip Kumar Das
Assot. Prof.& I.Q.A.C. Co-coordinator,
NAAC co-ordinator,
Dept. of English, Hijli College

Dr. Dipankar Parui
Assistant Professor,
Dept. of English
Hijli College

Dr. Nilay Kanti Barman.
Assistant Professor,
Dept. of Geography
Hijli College

Dr. Soumyajyoti Kabi
Assistant Professor,
Dept. of Physics
Hijli College

Ms. Suparna Sarkar
Assistant Professor & Head,
Department of Sanskrit,
Chakdaha College.

Contact Details:

Mr. Asit Kumar Sau (Mob: 8617867550 / 9647471711 WhatsApp no.)
Dr. Shiladitya Satpathi (Mob: 7980168921 / 9830933103 WhatsApp no.)
Mr. Rajib Sinha (Mob: 9064374742 / 9474894660 WhatsApp no.)

Registration Begins: September 13th, 2020.
Registration Ends: September 20th, 2020.
Programme Schedule: 21st -27th September, 2020.
Registration is Mandatory
Registration is Free of Cost.
Advisory Committee
Mrs. Papri Mukherjee (Asst. Professor, Hijli College)
Mr. Sandip Sarkar (Assistant Professor, Hijli College)
Mr. Ranjan Sarkar (Assistant Professor, Hijli College)
Ms. Anamika Barman (Assistant Professor, Hijli College)
Dr. Mithu Jana (Assistant Professor, Hijli College)
Mrs. Mun Mun Nandy (Assistant Professor, Hijli College)
Mr. Prakash Manna (Assistant Professor, Hijli College)
Mafuja Yasmin (Assistant Professor, Hijli College)
Mr. Ranajit Subba (Assistant Professor, Hijli College)
Dr. Swarup De (Assistant Professor, Hijli College)
Dr. Salmali Hui (Assistant Professor, Hijli College)
Organizing Committee Members
Mr. Subhranil Manna, SACT, Department of Sanskrit, Hijli College
Ms. Ranu Kolya, SACT, Department of Sanskrit, Hijli College
Mr. Goutam Maitra, SACT, Department Of Sanskrit, Garbeta College.
Mr. Amit Kumar Mondal, SACT, Department of Sanskrit, Srikrishna College
Ms. Riya Biswas, SACT, Department of Sanskrit, Srikrishna College
Ms. Joyita Rana Das, SACT, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College
Sri Subrata Pattanayak Head Clerk, Hijli College
ALL TEACHING AND NON-TEACHING STAFF OF HIJLI COLLEGE.

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

Special E-Lecture(National level)

on

Relevance of Srimad Bhagavad Gita in Modern Context

(वर्तमानसमये श्रीमद्भागवदीताया: प्रासङ्गिकता)

Organized by

DEPERTMENT OF SANSKRIT, SRIKRISHNA COLLEGE

(Affiliated to University of kalyani)

Bagula, Nadia,West Bengal,India

Accredited by NAAC:Grade 'B"(2nd cycle)

Dr. Sukdev Ghosh
Principal

Mr. Rajib Sinha
Head of the Depertment

-:Speaker:-

Mrs. Sharaddha Upadhey
Assistant Professor,
Dept. of Bharatiya Darshan,
Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University,
Ramtek, Maharashtra

DATE:- 13th December,2020
TIME:- 01:30--02:30 P.M

Join us on: You Tube Link—
https://www.youtube.com/watch?v=ehaMtriC87k
WhatsApp link:
https://chat.whatsapp.com/JBqVbCLEgoE19J5NBIgvh2
For any information:
Mr. Amit Kr.Mondal--8617653338

Organizing Committee
1.Mrs. Manjusha Chakraborty
2.Mrs. Riya Biswas
3.Mrs. Manju Ghosh
4.Mrs. Sudeshna Roy

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ
Special E-Lecture-No: 2(State level)
on
Yoga as a solution to the recent crisis
Organized by
DEPARTMENT OF SANSKRIT, SRIKRISHNA COLLEGE
(Affiliated to University of kalyani)
Bagula, Nadia, West Bengal, India
Accredited by NAAC:Grade 'B"(2nd cycle)
Dr. Sukdev Ghosh
Principal
Mr. Rajib Sinha
Head of the Department
--:Speaker:--
Mr. Bidyut Mondal
Assistant Professor,
Department of Philosophy
Presidency University
Kolkata, West Bengal
Medium: Bengali & English
DATE:- 18TH DECEMBER,2020
TIME:- 06:30–07:30 P.M
**Join us on: Youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=Az7ZmNiYL_o
**WhatsApp link:
https://chat.whatsapp.com/JBqVbCLEgoE19J5NBIgvh2
**For any information:
Mr. Amit Kr.Mondal--8617653338
Organizing Committee
1.Mrs. Manjusha Chakraborty
2.Mrs. Riya Biswas
3.Mrs. Manju Ghosh
4.Mrs. Sudeshna Roy

সংস্কৃতবিভাগীয় Proceeding প্রকাশ

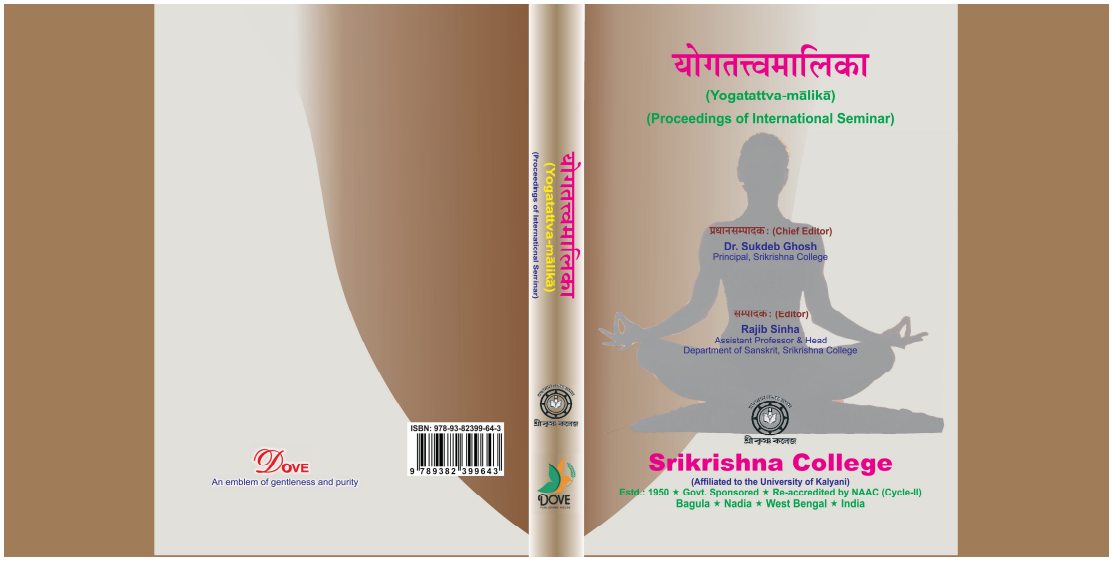

7 Days National E- Workshop
On
"Sanskrit Research Methodology"
Organized by
Department of Sanskrit, Chakdaha College (Affiliated to University of Kalyani), Chakdaha, Nadia, West Bengal, India
In Collaboration with
Department of Sanskrit, Srikrishna College, Bagula, Nadia, West Bengal, India
Department of Sanskrit, Hijli College, Hijli Co-operative, Paschim Medinipur, West Bengal, India
Date
18th – 24th September, 2020
Time
12:00 Noon to 2:00 p.m. (IST)
Platform
Google Meet
LIVE
YouTube LIVE
CHIEF PATRON
Dr. Swagata DasMohanta
Principal,
Chakdaha College
PATRON
Dr. Sukdeb Ghosh
Principal,
Srikrishna College
PATRON
Dr. Asis Kumar Dandapat
Principal,
Hijli College
Dear Participants,
It is our great pleasure to invite you to participate in the Seven Days national E- Workshop on "Sanskrit Research Methodology" on September 18-24, 2020 at 12:00 noon to 2:00 p.m. (IST), organized by Department of Sanskrit, Chakdaha College (Affiliated to University of Kalyani), Chakdaha, Nadia, West Bengal, India. In Collaboration with Srikrishna College (Affiliated to University of Kalyani), Bagula, Nadia, West Bengal, India and Hijli College (Affiliated to Vidyasagar University), Hijli, Paschim Medinipur, West Bengal, India. We cordially invite you to attend this Seven Days National E-workshop.

About the Workshop:

The monstrous virus Covid-19 has shaken the whole world. It has brought uncertainty, fear, social distancing, economic instability, depression and so many crises in our life. This situation is hampering research around the world. In this connection this type of academic engagement is important and inevitable for our existence. Actually creation and dissemination of knowledge through research is one of the core functions of the higher learning institutions. Apart from generating new knowledge, the higher learning institutions have the responsibility of training the intellectual manpower required for all sectors of the society. Quality of manpower is the most important factor for producing good quality researches. With the passage of time, various institutions continue to carry their own important role and improved methods in improving the quality of research. But in the current Corona atmosphere, research work is being hampered due to various reasons. This has raised a concern among the academic community, social thinkers and policy makers. Amongst all other factors, training of the researchers is the most crucial one. We need to think about how young researchers can do research independently without relying on anyone. To improve the situation there is a need for providing training on research methodology to the young scholars. The present workshop is an endeavor in this direction. The present workshop will focus on the following broad themes.

Tentative Contents

Unit- 1: Understanding the Research Process.
Unit- 2: Problem identification and preparatory work.
Unit- 3: Bibliographic Research.
Unit- 4: Research Design.
Unit- 5: Methodology, Methods, Tools and Techniques.
Unit- 6: Data Processing and Analysis and Interpretation.
Unit- 7: Report Writing.

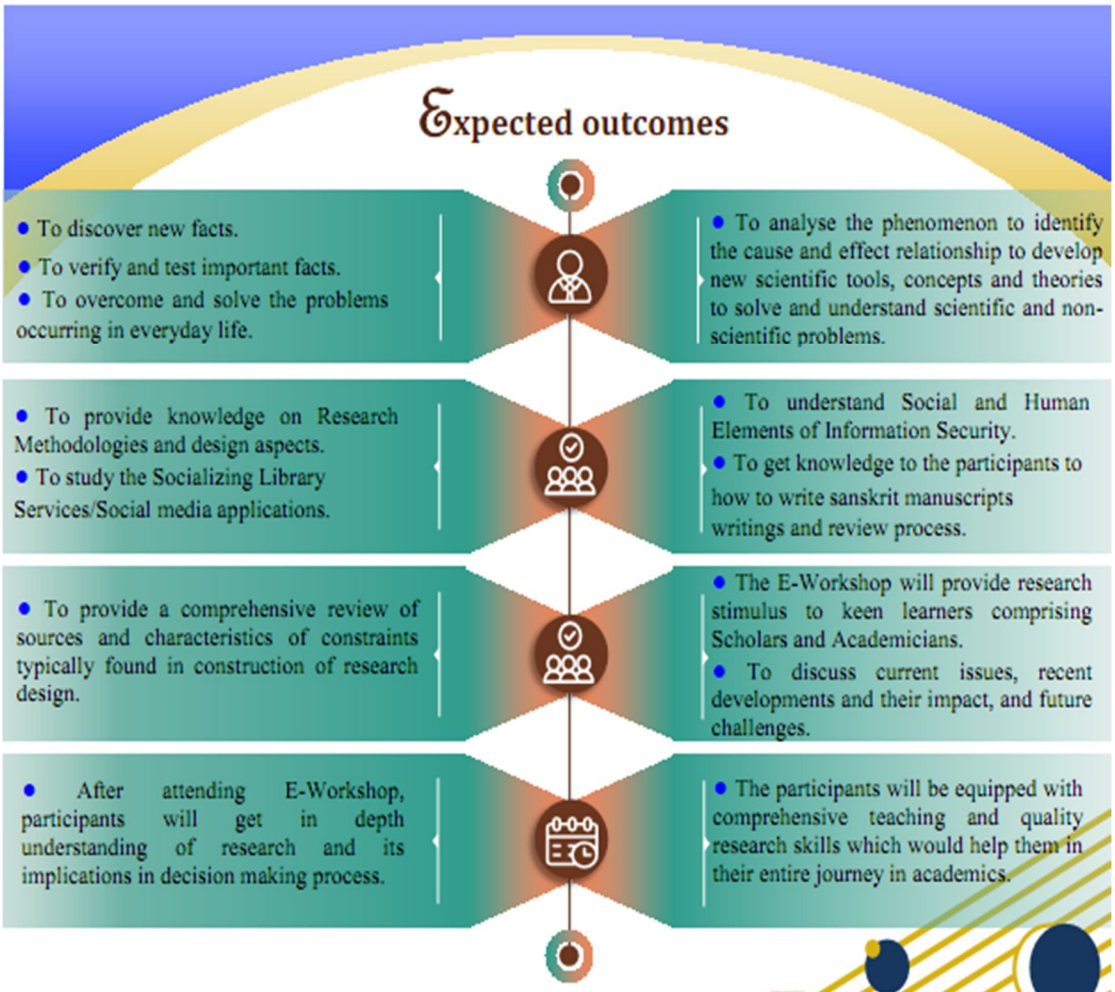

The E- Workshop is open to Faculty members (regular/ad-hoc/temporary) from any Indian university/college, registered M.Phil/Ph. D. research scholars and PG students. All the participants are requested to register online by visiting our brochure before September 17, 2020. Registration is mandatory for all the participants. For further queries, please e-mail on sanskritseminarcc@gmail.com

Who can attend?

Pedagogy

Virtual Session

Panel Discussion

Interaction with the expert in the field of Interdisciplinary Research along with the available opportunity.

Eminent Guests & Chief Speakers

Prof. (Dr.) Nilakantha Pati
Former Vice Chancellor, Shri Jagannath Sanskrit Viswavidyalay, Odisha, India; Former Professor, Department of Sanskrit, S.J.S.V., Odisha, India

Prof. (Dr.) Gopalchandra Misra
Former Vice Chancellor, University of Gour Banga, West Bengal, India; Professor, Department of Sanskrit, Rabindra Bharati University, West Bengal, India

Prof. (Dr.) Harihar Hota
Vice Chancellor, Shri Jagannath Sanskrit Viswavidyalay, Odisha, India

Prof. (Dr.) Shrinivasa Varkhedi
Vice Chancellor, Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Nagpur, Maharastra, India

Prof. (Dr.) Brajakishore Swain
Former Professor, Department of Sanskrit, Shri Jagannath Sanskrit Viswavidyalay, Odisha, India

Prof. (Dr.) Pyarimohan Pattanayak
Former Professor, Department of Sanskrit,
Shri Jagannath Sanskrit Viswavidyalay, Odisha, India

Prof. (Dr.) Kamalesh Mishra
Former Professor, Department of Sanskrit, S.J. S.
Viswavidyalay, Odisha, India

Prof. (Dr.) Vasant Kumar M. Bhatt
Professor, Gujarat University, Ahmedabad, India

Prof. (Dr.) Kirti kanta Sharma
Chief Editor, Indira Gandhi National Centre for the
Arts, New Delhi, India

Prof. (Dr.) Taraknath Adhikari
Senior Professor, Department of Sanskrit, Rabindra
Bharati University, Kolkata, India

Prof. (Dr.) Viroopaksha V. Jaddipal
Secretary, Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya
Pratishthan, Under Ministry of Education, Govt of India,
Ujjain, Madhya Pradesh

Prof. (Dr.) Madhusudan Penna
Professor, Department of Sanskrit, Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Nagpur, Maharastra, India
Prof. (Dr.) Bishnupada Mahapatra,
Professor, Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi, India
Prof. (Dr.) Satyanarayan Acharya
Professor, Department of Sanskrit, Rastriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, Andhra Pradesh, India
Prof. (Dr.) J.S.R.A Prasad
Professor, Department of Sanskrit, Hyderabad University, Telangana, India
Dr. Jaya Manikya Shastri
Associate Professor, Department of Sanskrit,S. J. S. Viswavidyalay, Odisha, India
Dr. Shibram R. Bhatt
Associate Professor, Research and Publication, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh

Members of the Steering Committee

CONVENOR

Dr. Shiladitya Satpathi,
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Chakdaha College

CO-CONVENOR

Mr. Asit Kumar Sau
Assistant Professor & Head, Department of Sanskrit, Hijli College

ORGANIZING SECRETARY

Mr. Rajib Sinha
Assistant Professor & Head, Department of Sanskrit, Srikrishna College

JOINT COORDINATORS

Dr. Anirban Banerjee
Assistant Professor, Department of Zoology, Chakdaha College

Dr. Shyam Sundar Sharma
Sanskrit Scholar, Delhi University

CULTURAL COORDINATOR

Ms. Mallika Banik
SACT, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College

TECHNICAL HEAD

Mr. Tamonash Das
A.S.P. College, Gangadharpur

TECHNICAL ASSISTANT

Mr. Anip Roy
NTS, Chakdaha College

Members of the Organizing Committee

- ***Ms. Suparna Sarkar**, Assistant Professor & Head, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College*
- ***Ms. Joyita Rana Das**, SACT, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College*
- ***Ms. Shreya Basu**, SACT, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College*
- ***Ms. Soma Bangal**, SACT, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College*
- ***Ms. Jui Dutta**, SACT, Dept. of Sanskrit, Chakdaha College*
- ***Mr. Amit Kumar Mondal**, SACT, Department of Sanskrit, Srikrishna College*
- ***Ms. Riya Biswas**, SACT, Department of Sanskrit, Srikrishna College*
- ***Mr. Subhranil Manna**, SACT, Department of Sanskrit, Hijli College*
- ***Ms. Ranu Kolya**, SACT, Department of Sanskrit, Hijli College*

Also with cordial support of all the Teaching and Non-Teaching Staff of Chakdaha College

E-Workshop Rules
• The E-Workshop begins on September 18, 2020. Details of the programme will be sent to the participants later.
• Google Meet, YouTube & Facebook link will be sent via WhatsApp Group before starting of the Webinar.
• Google Meet app is required to download via Play store.
• Login limit of Google Meet App is 250 only. So please start joining at least 15 minute prior of schedule. Rest of the participants can join live in YouTube or in Facebook.
• E – Certificate will be given to the registered participants after successful payment verification and feedback form submission.
• Participants should attend 90% sessions to be eligible for certificate.
• As the E-Workshop is being organized for giving prime importance to willing and serious participants who are eager to learn. In this context, it should be noted that certificates will be awarded to only those participants who will be present online and engaged during each session of the E-Workshop. Therefore, participants must attend all the online sessions in order to receive a certificate of participation.
All academicians/Researchers/Research scholars related to the Sanskrit Research Methodology theme are kindly requested to submit original Paper (within 3000 words) within next 35 days after the Programme for publication in proceedings with ISBN at the Email Id: sanskritseminarcc@gmail.com
Call for Papers
•For more information about the guidelines, please contact at
✓ Dr. Shiladitya Satpath 7980168921, 9830933103 (WhatsApp no.)
✓ Mr. Rajib Sinha 9064374742, 9474894660 (WhatsApp no.)
✓ Mr. Asit Kumar Sau 8617867550, 9647471711 (WhatsApp no.)

Registration Details
Every participant will be required to pay the registration fees of Rs. 200 (Two hundreds Rupees only) and for outside India $5 through NEFT/RTGS. Registration fee will be non-refundable.
Account Name: CHAKDAHA COLLEGE
Account Number: 422110100003145
Bank: BANK OF INDIA Branch: CHAKDAH
IFSC: BKID0004221
MICR Code: 700013514
Once the payment is made, take the screenshot of payment receipt & then fill the following registration form by browsing the following link:
https://forms.gle/YAwpgQfzKN4Q4i6b8
Or you can scan the QR code for registration.
Or join through Google registration form (click here):
The participants are advised to carefully fill their transaction details of payment at the time of filling of registration form.
Please note that requests for late applications will not be entertained.
Registration Process
First step: Participants will fill up the online application form with all required details & make payment within the final date of submission. The final date of submission is 17th September, 2020 at 4:00 p.m. (IST).
Second step: After successful registration & payment, a list of participants will be given to the respective WhatsApp groups on 17th September, 2020 at 6:00 p.m. (IST).
Contact Details
Dr. Shiladitya Satpathi
7980168921, 9830933103(WhatsApp no.)
shiladitya2414@gmail.com
Mr. Rajib Sinha
9064374742, 9474894660 (WhatsApp no.)
rajib.sinha1001@gmail.com
Mr. Asit kumar Sau
8617867550, 9647471711 (WhatsApp no.)
asitsau046@gmail.com
Important Date & Schedule
Registration begins: September 07, 2020
Registration ends: September 17, 2020 at 4:00 p.m. (IST)
Programme schedule: September 18-24, 2020

Guests & Speakers

Prof. Dr. Gopalchandra Misra
Professor, Dept. of Sanskrit,
Rabindra Bharati University.
Former Vice-Chancellor,
Gour Banga University

Prof. Dr. Sanghamitra Sengupta
Former Professor,
Dept. of Sanskrit,
University of Calcutta.

Prof. Dr. Pralay Kr. Nanda
Dean, Faculty of Vedic Science,
Maharshi Mahesh Yogi Vedic
Vishwavidyalay, Madhyapradesh.

Prof. Dr. Gabbita Anjaneya Shastri
Professor, B.H.U, Varanasi

Prof. Dr. Bishnupada Mahapatra
Professor,
Sri Lal Bahadur Shastri National
Sanskrit University

Prof. Dr. Kamalesh Mishra
Former Professor,
S.J.S.V, Puri, Odisha.

Prof. Dr. Pyarimohan Pattanayak
Former Professor,
S.J.S.V, Puri, Odisha.

Dr. G. Jayamanikya Shastri
Associate Professor,
S.J.S.V, Puri, Odisha.

Dr. Priyamvada Kafle
Associate Professor,
Nepal Sanskrit University,
Kathmandu, Nepal.

Dr. Piyus Kanti Bhuin
Assistant Professor
Dept. of management,
Brainware University

Patron
Mr. Anup Kr. Bhadra
President of Governing Body
Srikrishna College

Chairperson
Dr. Sukdeb Ghosh
Principal
Srikrishna College

Convenor & Organizer
Mr. Rajib Sinha
Assistant Professor & Head,
Dept. of Sanskrit, Srikrishna College.

Co-convenor
Dr. Sajijul Islam
Assistant Professor, Dept. of Commerce,
Srikrishna College

Advisory Committee	Organizing Committee Members	
1. Prof. Mahuya Ghosh (Asso. Prof. I.Q.A.C, Co- ordinator) 2. Prof. Somnath Chakraborty (Asso. Prof., Bursar) 3. Dr. Kalyani Dhar (Asso. Prof., T.C.S) 4. Prof. Puspita Mahata (Asst. Prof., NAAC Co-ordinator)	1. Dr. Shiladitya Satpathi (Asst. Prof., Chakdaha College) 2. Dr. Uttam Biswas (Asst. Prof., V.U) 3. Prof. Asit Kr. Sau (Asst. Prof., Hijli College) 4. Dr. Pranab Das(Asst. Prof., Sri Krishna College) 5. Prof. Arijit Chowdhury (Asst. Prof., Sri Krishna College)	6. Sudeshna Roy (Faculty Member) 7. Manjusha Chakraborty (Faculty Member) 8. Amit Kr. Mondal (Faculty Member) 9. Riya Biswas (Faculty Member) 10. Manju Ghosh (Faculty Member)

Invites you for

Two Day International Webinar

on

"Relevance of Yogaśāstra in Modern Context"

वर्तमानसमये योगशास्त्रस्य प्रासङ्गिकता

Date: 3rd & 4th July, 2020, Time: 12:00 P.M. to 03:00 P.M.

Organized by

Department of Sanskrit, Srikrishna College
(Affiliated to University of Kalyani)
Bagula, Nadia, West Bengal, India.

Accredited by NAAC :- Grade 'B' (2nd Cycle)

Google Meet

Free Registration
Limited Seat

संस्कृतविभागीय-प्राकारपत्रिका

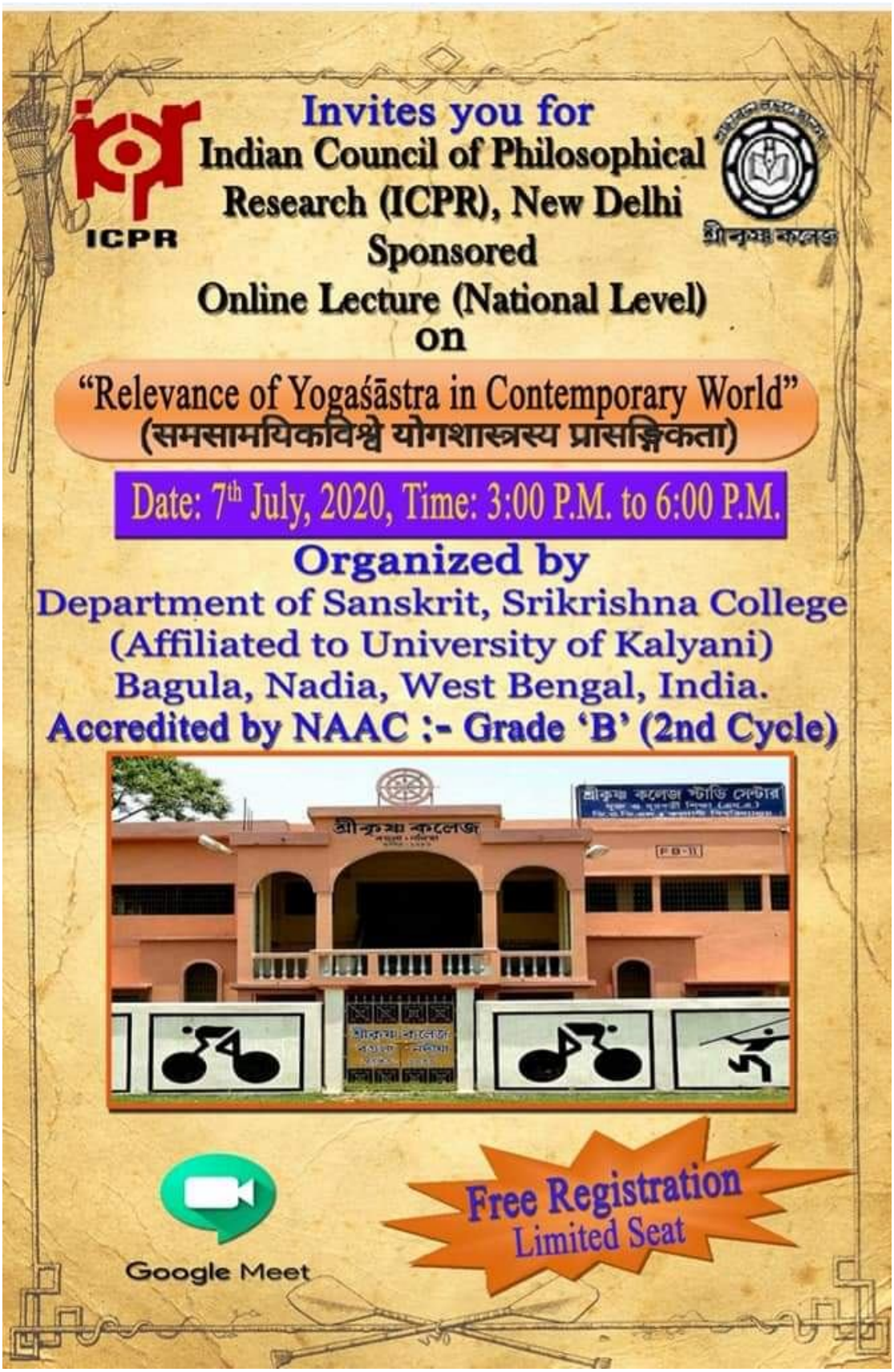
ICPR
Invites you for
Indian Council of Philosophical Research (ICPR), New Delhi
Sponsored
Online Lecture (National Level)
on
"Relevance of Yogaśāstra in Contemporary World"
(समसामयिकविश्वे योगशास्त्रस्य प्रासङ्गिकता)
Date: 7th July, 2020, Time: 3:00 P.M. to 6:00 P.M.
Organized by
Department of Sanskrit, Srikrishna College
(Affiliated to University of Kalyani)
Bagula, Nadia, West Bengal, India.
Accredited by NAAC :- Grade 'B' (2nd Cycle)
Google Meet
Free Registration
Limited Seat

Speakers

Prof. Dr. Nilakantha Pati (D. litt)
Former Vice Chancellor,
Sri Jagannath Sanskrit
Vishwavidyalaya, Puri, Odisha.

Prof. Dr. Piyushkant Dixit
Professor, SLBSRSV, New Delhi,
Formar Vice Chancellor,
Uttrakhand Sanskrit University.

Prof. Dr. Chandan Bhattacharyya
Professor & Head,
Dept.of Sanskrit,
University of Gour Banga.

Patron
Mr. Anup Kr. Bhadra
President of Governing Body
Srikrishna College

Chairperson
Dr. Sukdeb Ghosh
Principal
Srikrishna College

Convenor & Organizer
Mr. Rajib Sinha
Assistant Professor & Head,
Dept. of Sanskrit, Srikrishna College.

Co-convenor
Dr. Sajijul Islam
Assistant Professor,
Dept. of Commerce,
Srikrishna College.

Advisory Committee	Organizing Committee Members	
1. Prof. Mahuya Ghosh (Asso. Prof. I.Q.A.C, Co- ordinator)	1. Dr. Shiladitya Satpathi (Asst. Prof., Chakdaha College)	6. Sudeshna Roy (Faculty Member)
2. Prof. Somnath Chakraborty (Asso. Prof., Bursar)	2. Dr. Uttam Biswas (Asst. Prof., V.U)	7. Manjusha Chakraborty (Faculty Member)
3. Dr. Kalyani Dhar (Asso. Prof., T.C.S)	3. Prof. Asit Kr. Sau (Asst. Prof., Hijli College)	8. Amit Kr. Mondal (Faculty Member)
4. Prof. Puspita Mahata (Asst. Prof., NAAC Co-ordinator)	4. Dr. Pranab Das(Asst. Prof., Sri Krishna College)	9. Riya Biswas (Faculty Member)
	5. Prof. Arijit Chowdhury (Asst. Prof., Sri Krishna College)	10. Manju Ghosh (Faculty Member)

Registration Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPJz0bnhDi_28XiZrRy7oXCGys1Zf2vtKU94hEO3SDfOmiug/viewform?usp=sf_link

WhatsApp Link

1. https://chat.whatsapp.com/LCeNRJAQ8a89puKcrnTrvQ

OR

2. https://chat.whatsapp.com/C5oeMZomRmCJ5Awuhef5pf

*Join us on "Google Meet" [Google Meet Link will be sent via Mail before Starting Program

Registration & feedback submission are mandatory to get the E-Certificate.

Contact for Registration: - 1. Mr. Rajib Sinha. Contact No – 9064374742/9474894660

2. Dr. Sajijul Islam. Contact No – 8250511863/9475011605

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ
বিভাগীয়ছাত্রস্তরীয়-ই-সংগোষ্ঠী
DEPARTMENTAL STUDENTS' SEMINAR(ONLINE)
ORGANIZED BY
DEPARTMENT OF SANSKRIT,SRIKRISHNA COLLEGE
Bagula, Nadia,West Bengal,India
বিষয়:- সমকালীন সংস্কৃতসাহিত্য: বিবিধ বিমর্শ
PRINCIPAL
Dr. Sukdev Ghosh
HOD & CONVENOR
Mr. Rajib Sinha
-:GUEST:-
Dr. Palash Biswas
Assistant Professor
Sanskrit College and University,
Department of Advita Vedanta
Traditional Oriental Learning,
Kolkata,W.B,India
DATE:- 15th July,2021
TIME:- 12:00—4:00 P.M
-:Platform:-
GoggleMeat link:
https://meet.google.com/jpw-kmsc-kzg
CO-ORDINATORS
Mrs. Sudeshna Roy
Mrs.Manjusha Chakraborty
Mr. Amit Kr. Mondal
Mrs. Riya Biswas
Mrs. Manju Ghosh
N.B-The essays given by the students will be Published in the departmental magazine.
For any information:
Mrs. Sudeshna Roy:-9153686018
Mrs. Riya Biswas:-7001327849

------:LIST OF PARTICIPANTS:------

1ST SEMESTER

SL NO.	NAME	NAME OF TOPIC
1.	SUMAN SARKAR	বৈদিকযুগের গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা
2.	SONIA AGARWAL	ভারতীয়সমাজে নীতিকথামূলকগ্রন্থানাং প্রভাবঃ
3.	AHANA ACHARYYA	মহাকবি ভাস
4.	SIMA BISWAS	মানবজীবনে কর্মযোগের ভূমিকা
5.	DIPJYATI MONDAL	কবি জয়দেব এবং গীতগোবিন্দ
6.	SUCHISMITA PAUL	শ্রীমদ্ভাগবদগীতা
7.	PAYEL BISWAS	শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনযোগ
8.	RIYA BISWAS	বৈদিক দেবতা
9.	RIYA ROY	অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে কালিদাসের প্রকৃতি চেতনা
10.	RIMA SARKAR	কর্ম ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানযোগের ভূমিকা
11.	TAMA MONDAL	ভারবি ও তাঁর কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের বিবরণ
12.	ANNAPURNA SANYAL	আমাদের রামায়ণের প্রাচুর্য্য
13.	ANAMIKA BISWAS	বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা
14.	SOMA MUKHERJEE	লোকসচেতনায় উপনিষদের অবদান
15.	SUSMITA SHIL	কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি

3RD SEMESTER

16.	ALPANA PAUL	আদর্শ নারীত্ব ভাবনায় ভবভূতি
17.	PRIYA BISWAS	দর্শনসাহিত্যের ইতিহাসে মানবিক মূল্যবোধ
18.	ANKITA BAIRAGI	কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পরিবেশ সচেতনতা
19.	PRIYANKA MONDAL	সংস্কৃত সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ
20.	NIRUPAMA BISWAS	সংস্কৃত ভাষার প্রাক্ ইতিহাস
21.	PRINCHI BISWAS	বৈদিক দেবতা
22.	SHIULI HANIP	কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি
23.	SUSMITA PODDER	অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে কালিদাসের প্রকৃতি চেতনা
24.	SANCHITA BHOWMICK	বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

6TH SEMESTER

25.	DEBANJANA DAS	বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা
26.	RINKY PAL	অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে প্রতিফলিত সমাজচিত্র
27.	SATHI MONDAL	জীবনে যোগের উপকারিতা
28.	NEHA MONDAL	অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে কালিদাসের প্রকৃতি চেতনা
29.	AYANTIKA GHOSH	অথর্ববেদে আয়ুর্বেদের চিকিৎসাজ্ঞান
30.	LABANI PAUL	সংস্কৃতসাহিত্যে রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা

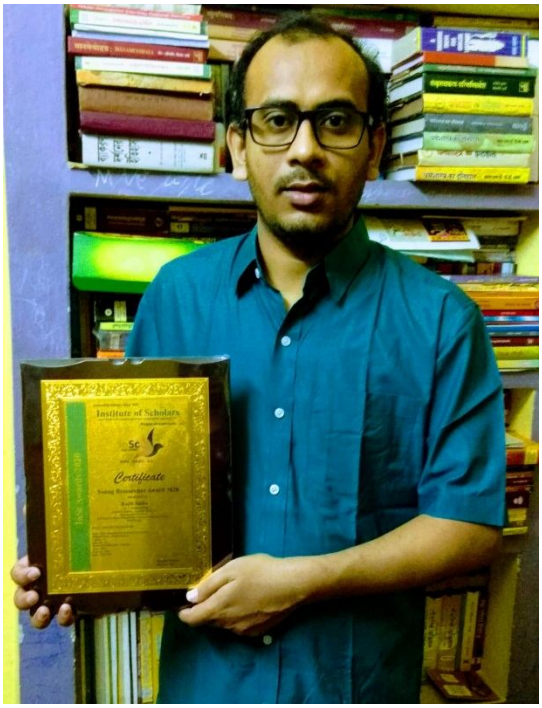

বিভাগীয় প্রধানের Award-লাভের কতিপয় চিত্র

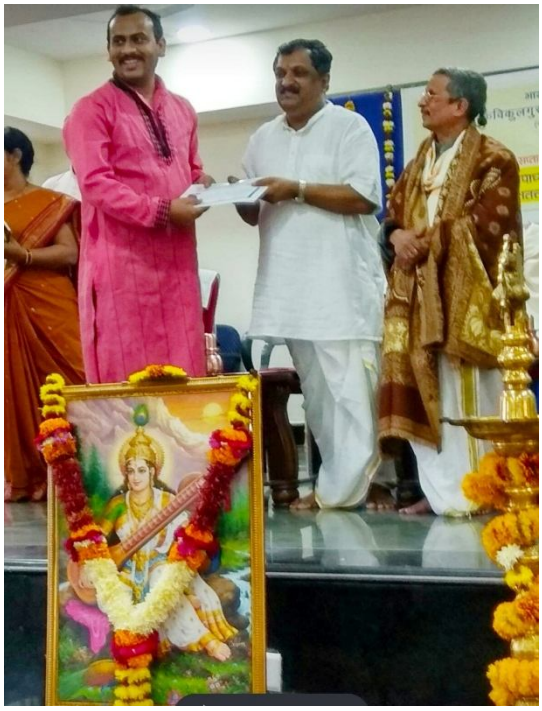

Online state level seminar
on
Student welfare schemes
Organized by
Depertment of Sanskrit, Srikrishna College
(Affiliated to University of kalyani)
Bagula, Nadia,West Bengal,India
Accredited by NAAC:Grade 'B"(2nd cycle)
PRINCIPAL
Dr. Sukdev Ghosh
HOD & CONVENOR
Mr. Rajib Sinha
-:Guest:-
Dr. Palash Biswas
Assistant Professor
Sanskrit College and University,
Department of Advita Vedanta
Traditional Oriental Learning,
DATE:- 1st January,2022
TIME:- 7:30–9:30 P.M
-:Guest:-
Mr. Asit Kumar Sau
Assistant Professor & Head
Department of Sanskrit
Hijli College
-:Platform:-
GoggleMeat/Streamyard
JOINT CONVENOR
Mrs. Sudeshna Roy
Mrs.Manjusha Chakraborty
Mr. Amit Kr. Mondal
Mrs. Riya Biswas
Mrs. Manju Ghosh
Any information:
Mrs. Sudeshna Roy:-9153686018

Department of Sanskrit

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

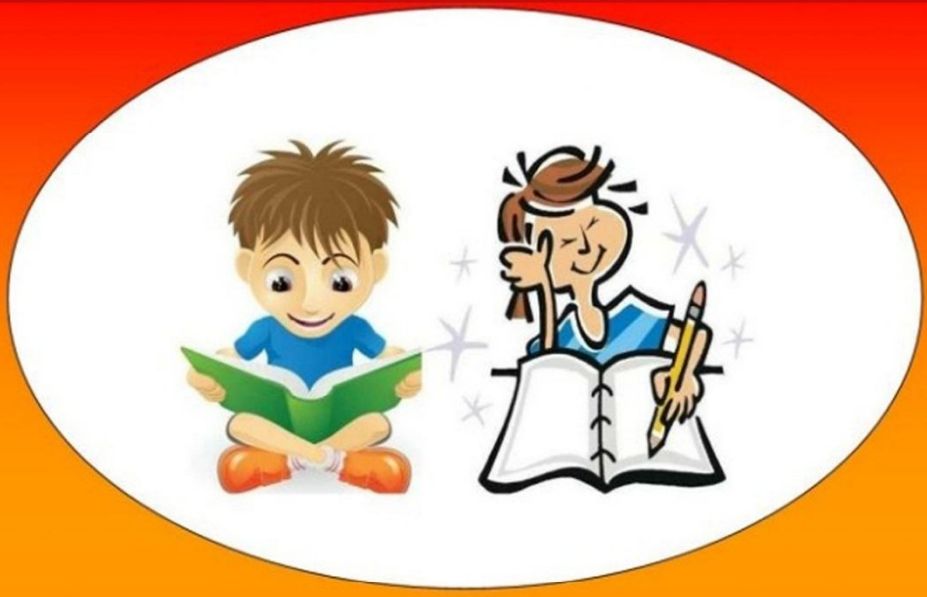

सुखार्थिनः कुतोविद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्।
सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्।।

Srikrishna College

(Affiliated to the University of Kalyani)
Estd.: 1950 Govt. Sponsored Re-accredited by NAAC (Cycle-II)
Bagula, Nadia, West Bengal, India